POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة:186)

কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইতে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না। এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(বাকারা: ১৮৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

সংখ্যা 13

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 30 শে মার্চ, 2023 7 রমযান 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ফজর ও এশার নামাযের গুরুত্ব

যাচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

১৪৮০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন:

তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি রজ্জু নিয়ে সকালে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে যায় এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলি বিক্রি করে নিজের অন্ন সংস্থান করে এবং সদকাও করে। তার জন্য লোকের কাছে চাওয়ার থেকে এই কাজটি উত্তম।

সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

১৪৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া সদকা হিসেবে দেন। অতঃপর তিনি সেটিকে বিক্রি হতে দেখে নিজেই কিনে নিতে চান। তিনি (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, নিজের সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নিও না।

১৮৮৫) হযরত মিকদাম (বিন মাআদী কারাব) (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, মানুষের নিজের হাতে উপার্জিত অর্থে আহার করার চাইতে উত্তম আহার নেই। আল্লাহ্ তা'লার নবী হযরত দাউদ (আ.) নিজের হাতে উপার্জিত অর্থেই সংসার নির্বাহ করতেন।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

জুমআর খুতবা, ১০ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

আর খোদা তা'লা জানেন এবং তিনি সাক্ষী আছেন যে, আমিই সেই সাদিক ও আমীন এবং প্রতিশ্রুত পুরুষ যার আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আমার জামাতের মধ্যে কপটতা নেই আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্দৃষ্টি ভুল করে নি। কেননা,আমি সেই ব্যক্তি যাকে সেই সব ঈমানী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীদের জন্য গ্রহণ করা অনিবার্য ছিল। আর খোদা তা'লা জানেন এবং তিনি সাক্ষী আছেন যে, আমিই সেই সাদিক ও আমীন এবং প্রতিশ্রুত পুরুষ যার আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। কিন্তু যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে নি, তারা এই আশিস থেকে বঞ্চিত। অন্তর্দৃষ্টি একপ্রকার নিদর্শন। এই শব্দটি 'ফা-র উপর জের ও জাবার' দুটি নিয়েই গঠিত হয়ে 'ফা' এবং 'ফি' সহ যথাক্রমে 'ফারাসাত এবং ফিরাসত শব্দের উৎপত্তি ঘটায়। জাবার-যুক্ত শব্দ 'ফারাসাত' এর অর্থ হল অশ্বারোহন। মোমেন তার প্রবৃত্তির ঘোড়ার উপর সওয়ার হয় এবং তাকে এক জন দক্ষ অশ্বারোহীর ন্যায় পোষ মানায়। মোমেন খোদার পক্ষ থেকে এক জ্যোতি লাভ করে যা দিয়ে সে পথের দিশা পায়। এই কারণেই রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ

অর্থাৎ মোমেনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করে চল, কেননা সে খোদার জ্যোতি দ্বারা দেখে। বস্তুত, আমাদের জামাতের সত্য অন্তর্দৃষ্টির সব থেকে প্রমাণ হল,তারা খোদার জ্যোতিকে সনাক্ত করেছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

কবিদের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে আনন্দ দেওয়া এবং মানুষের প্রশংসা কুড়োনো।

يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ○ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ○ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

অনুবাদ: আর যে আছে কবিগণ- বিপথগামীগণই তাহাদের অনুসরণ করে। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, তাহারা উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং তাহারা যাহা বলে তা পালন করে না?

সূরা শোয়রার ২২৫-২২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ তোমরা কি দেখনা যে, কবি বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কখনও এদিক সেদিকের কথা বলে। তাদের সামনে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে না, বরং যা কিছু তাদের মাথায় আসে,তা নিয়ে কিছু না কিছু তারা বলতে শুরু করে দেয়। কবিদের কোনও কবিতার উদাহরণ নিলে فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ , এর দৃশ্য তাদের প্রতিটি কবিতায় তোমরা দেখতে পাবে। একটি কবিতায় লেখা থাকবে আমি মারা গেছি। আমার প্রেমাস্পদ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমি তার বিরহে, তার রুক্ষ আচরণে উন্মাদ হয়ে গেছি । কিন্তু পরের কবিতাতেই লিখছে, আমি আমার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হলাম, আমি প্রাণ ফিরে পেলাম, জীবিত হয়ে উঠলাম। সমগ্র কবিতার একটি পঙক্তিও অপরটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একটি পঙক্তিতে সে একথা বলে, অপরটিতে অন্য কিছু। একটি পঙক্তিতে লেখে, প্রেমাস্পদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে, দ্বিতীয়টি লেখে, আমি মরে যাচ্ছি। মোটকথা, তাদের কবিতার প্রতিটি ছন্দে স্ববিরোধ পাওয়া যায়। কবিতার কোনও হাত-পা থাকে না। অসঙ্গত কথাবার্তা থাকে কেবল। কখনও বলে, প্রেমাস্পদের ভালবাসায় মারা গেছি, অথচ সে জীবিত দাঁড়িয়ে কবিতা শোনাচ্ছে। কখনও বলে, আমি আমার প্রেমাস্পদের প্রেমে বিভোর। অথচ সে সুন্দর দুনিয়ার কাজ করছে। কখনও বলে, প্রেমাস্পদ সর্বক্ষণ তার অন্তরে থাকে আর একথা একেবারে মিথ্যা। কখনও বলে, আমি প্রেমাস্পদের জন্য যারপরনায় মর্মযাতনায় কাতরাচ্ছি, অথচ সে নির্বিঘ্ন ও আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করছে। সে মরেও না মর্মযাতনাও পোহায় না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য মানুষের ভাবাবেগকে উস্কে দেওয়া, সেটা ইতিবাচকভাবে হোক বা নেতিবাচকভাবে। কখনও সে আনন্দের কথা বলে, কখনও দুঃখের। আল্লাহ তা'লা বলেন فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ অর্থাৎ তারা জঙ্গল ও প্রতিটি উপাত্যকায় উন্মাদের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়। তারা কোথাও ভাবাবেগকে উত্তেজিত করার কোনও উপাদান পেলেই তা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা কখনও প্রেমিককে আনন্দ দেয়, কখনও প্রেমাস্পদকে। তারা ধনীদেরকে আনন্দিত করে আবার দরিদ্রদেরকেও। তারা অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়কেই খুশি করে। তারা বিজয়ী ও বিজীত উভয়কেই খুশি করে।

(এরপর ৮ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহহুদ, তা'উয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় করোনা কবলিত কয়েকটি বছর পর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইউকে পুনরায় বৃহত্তর পরিসরে তাদের জাতীয় ইজতেমা উদ্‌যাপনের সুযোগ পেয়েছে।

আমি দোয়া করি এবং আশা রাখব যে, আপনারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে ব্যাপকভাবে লাভবান হয়ে থাকবেন। লাজনা সদস্যাদের সদা ভাবা উচিত এবং চিন্তা করা উচিত যে, এই অঙ্গসংগঠনের মূল উদ্দেশ্য কী? লাজনা ইমাইল্লাহর অংশ হওয়ার অর্থ কী? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যখন লাজনা ইমাইল্লাহর সংগঠন গঠন করেন, তখন তিনি গভীর চিন্তাভাবনার পর এই সংগঠনের এই নাম দিয়েছেন। লাজনা ইমাইল্লাহর আক্ষরিক অর্থ হল, আল্লাহর দাসীদের সংগঠন। আপনারা যেখানে আল্লাহর দাসীদের সংগঠনে যোগ দিয়েছেন আর নিজেরা ধর্মের খেদমতের অঙ্গীকার করেছেন সেক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝতে হবে। প্রথম কথা হল, সব সদস্যার নিজের ঈমান এবং বিশ্বাসের সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের সেই আধ্যাত্মিক মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে যা একজন বিশ্বাসীর জন্য আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে নিরক্ষর মরুবাসীদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কুল লাম তু'মিনু ওয়ালাকিন কূলূ আসলামনা, বল যে, তোমরা এখনও বিশ্বাস কর নি কিন্তু এ কথা বলতে পারো যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, মরুবাসীরা এটি বলতে পারে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা মুসলমান হয়ে গেছে, তাদের মু'মিন হওয়া বা বিশ্বাস করার অথবা সত্যিকার বিশ্বাস অর্জনের দাবি করা উচিত নয়। তখনও তারা সেটি অর্জন করতে পারে নি। তার কারণ হল, ঈমানের দাবি এবং ইসলামের দাবি কিন্তু ভিন্ন বিষয়। যে কলেমা পাঠ করে সে বলতে পারে যে, আমি মুসলমান কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির এ কথা বলার অধিকার নেই যে, সে সত্যিকার অর্থে ঈমানদার হয়ে গেছে। এই দাবি করা যে, আল্লাহ্ তা'লা সর্বশক্তিমান সত্তা আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রসূল এবং ইসলাম খাঁটি ধর্ম- এটি বিশ্বাসের মৌলিক দিক।

নিরঙ্কুশ ঈমানের জন্য উন্নতমানের বিশ্বাস থাকা দরকার। আর সেই পর্যায়ে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ আল্লাহর সব নির্দেশ সে মেনে না চলে। তাই প্রথম বিষয় যা প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত তা হল, তাদেরকে ঈমানে পরিপূর্ণ হতে হবে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, মু'মিন তারা যাদের কর্ম তাদের বিশ্বাসের সত্যায়ন করে, হৃদয়ে বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রথিত থাকা উচিত। মু'মিন তারা যারা তাদের খোদাকে প্রধান্য দেয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়।

অতএব নিজের বিশ্বাসকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়া মু'মিন হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও এটি মৌলিক বিষয়। স্মরণ রাখা উচিত, নিজের ঈমানকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়া, এটি এমন একটি অঙ্গীকার যা প্রত্যেক আহমদী আহাদনামা পাঠ করার সময় করে থাকে আর এটি আমাদের বয়আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, বিশ্বাসীরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খুব অবিচলতার সাথে তাকওয়ার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ পথ বা কঠিন পথ অতিক্রম করে আর তারা খোদার ভালবাসার সাগরে নিমজ্জিত থাকে। সত্যিকার বিশ্বাসী বা মু'মিন তাকওয়ার পথে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। জাগতিক চ্যালেঞ্জ যেমনই হোক না কেন, তারা আল্লাহকেই সবকিছু মনে করে। আর তাদের পুরো সত্তা আর পুরো জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা জাগতিক কামনা-বাসনা তাদের যা-ই থাকুক না কেন, খোদার ভালবাসার মোকাবিলায় সেগুলো তাদের সামনে অর্থহীন এবং গুরুত্বহীন। মানুষ তাদের প্রিয়জনের অনেক যত্ন নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে অথবা প্রিয়জনদের জাগতিক চাহিদা পূর্ণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে কিন্তু যদি জাগতিক সম্পর্ক এবং চাহিদা তাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, এমন মানুষ সত্যিকার অর্থে নিষ্ঠাবান মু'মিন হতে পারে না। তিনি (আ.) আরও বলেন, সত্যিকার মু'মিন তারা যারা সেসমস্ত বিষয় থেকে দূরে অবস্থান করে যেগুলো মিথ্যা প্রতিমার ন্যায় হয়ে থাকে অথবা যেগুলো খোদার সন্তুষ্টির পথে বাধা হয়ে থাকে। সেগুলো নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা হোক বা অপকর্ম বা ঔদাসিন্য অথবা আলস্যই হোক না কেন। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে প্রতিটি মোড়ে রয়েছে প্রলুব্ধি যা মানুষকে বিভিন্ন পাপের দিকে নিয়ে যায় অথবা এমন দিকে নিয়ে যায় যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। সত্যিকার অর্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ বুঝেই না যে, তার আচরণ ভুল। যেমন কিছু মানুষ প্রতিবেশির সাথে ভাল সম্পর্ক রাখে না এবং তাদের প্রাপ্য দিতে ব্যর্থ হয়। আর সত্যিকার অর্থে কাউকে ঠাট্টা করা বা তিরস্কার করা সম্পূর্ণরূপে অন্যায়।

আরেকটি সামাজিক রোগ যা আমাদের ইজতেমা বা জলসায়ও এগুলো দেখা যায় যে, মহিলারা নিজেদের জন্য একটা ভাল জায়গা অন্বেষণ করে বা সন্তানদের বসার জন্য ভাল জায়গা খোঁজে কিন্তু অন্য কোনো শিশু যদি তাদের কাছে আসে, তারা তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এমনও দেখা গেছে যে, এক মা তার সন্তানকে কিছু খাওয়ার জন্য দিচ্ছে কিন্তু অন্য শিশু যে পাশে বসে আছে তাকে দিচ্ছে না। শিশুর খাবার অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে খাওয়ার দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে না বরং তাদেরকে বঞ্চিত রাখে। এটি ঘৃণ্য আচরণ। স্মরণ রাখবেন, অন্যের প্রতি যদি আপনি দয়া প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হন তাহলে আপনার শিশুরাও এটি শিখবে।

অপরদিকে আপনি যদি দয়ালু হন, বিবেচনা করে কাজ করেন তাহলে আপনার সন্তানরা এটি দেখবে এবং আপনাদের কাছে শিখবে আর এভাবে আপনার সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আপনার সন্তানদের তরবিয়ত করতে পারবেন। পবিত্র কুরআনের যে আয়াত আমি পড়েছি সেই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, এই দাবি কর না যে, আমরা ঈমান এনেছি বরং দাবি কর যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তার অর্থ হল, সত্যিকার বিশ্বাস ততক্ষণ হৃদয়ে প্রোথিত হয় না যতক্ষণ না আল্লাহর সামনে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা হয়। আমাদের জামা'তের প্রেক্ষাপটে আল্লাহর আনুগত্যের দাবি হল, আহমদী জামা'তের অঙ্গসংগঠনের প্রতি অর্থাৎ নেযামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। স্মরণ রাখবেন, আমাদের জামা'তের নেযাম বা ব্যবস্থাপনা যুগ-খলীফা গঠন করেছেন। এটি সেই সত্য ব্যবস্থাপনা যা বিভিন্ন জামা'ত এবং অঙ্গসংগঠন হিসেবে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নির্দেশে এগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। যদি জামা'তের কর্মকর্তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে অথবা তার আচার-আচরণ যদি দুশ্চিন্তার কারণ হয় তাহলে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার কাছে সেই কর্মকর্তার বিষয়টি তুলে ধরা উচিত। কিন্তু কোনো বৈঠকে বসে সেটি সাধারণ সভা হোক অথবা ব্যক্তিগত মিটিং হোক, সেখানে যদি এমন কোনো ব্যক্তির সাথে ভ্রান্ত আচরণ করেন যার সাথে আপনার ঝগড়া আছে তাহলে সেটি অন্যায় কাজ এবং জামা'তের সত্যিকার শিক্ষা পরিপন্থী, এমন আচরণের কোনো ভাল ফলাফল সামনে আসতে পারে না। বরং এর ফলে মনমালিন্য আরও বাড়বে। আর এভাবে অভিযোগকারীর ঈমান আরও দুর্বল হতে থাকবে।

এটিও দেখা গেছে যে, স্থানীয় পর্যায়ে আহমদীরা যদি স্থানীয় কর্মকর্তাদের কথা যদি মানতে ব্যর্থ হয় অথবা যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের নির্দেশ পালনে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এর ফলে দলাদলি ও ভেদাভেদ আরও বাড়ে। এমন মানুষ তখন খেলাফতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা আরম্ভ করে এবং তারা খলীফাতুল মসীহর নির্দেশও পালনে ব্যর্থ হয়। এর ফলে এমন মানুষ ধর্ম থেকে দূরে ছিটকে যায় এবং তারা ঈমানহারা হয়। স্মরণ রাখতে হবে, মানুষের যে সত্যিকার অভিযোগ আছে সেগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত নয় বরং বৃথা তর্কে লিপ্ত না হয়ে জামা'তের ভিতর ভেদাভেদ বা দলাদলি সৃষ্টি করার পরিবর্তে বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে সঠিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।

আপনাদের আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, ঈমানের মৌলিক দাবি হল, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা। আর নেযাম বা ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির সংশোধনের জন্য মৌলিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। একইভাবে এটি মুসলমানদের সমষ্টিগত মানকেও উন্নত করে। যদিও মহিলাদের জন্য মসজিদে এসে ইবাদত করা আবশ্যক নয় কিন্তু যখনই তারা ইজতেমা বা ঈদের নামাযে মসজিদে আসে, সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা নামাযের সরিগুলো সোজা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যখন ইজতেমাতে বা জলসায় অথবা লাজনার অনুষ্ঠানে আসে তখন সেই প্রোগ্রামের গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত আর এটি তখনই বজায় রাখা সম্ভব যখন তারা পূর্ণ মনোযোগসহ তা শোনে এবং যেসব ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় অথবা যা তারা শেখে তা যদি তারা অনুসরণ করে। নামাযেই যদি আমরা সারি সোজা রাখতে ব্যর্থ হই আর জলসা বা ইজতেমায় যদি আমরা এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করি আর যারা দায়িত্ব পালন করছে তাদের কথা অমান্য করি, তারা

এরপর ৯ পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

তোমাদের জন্য এক অপরিহার্য শিক্ষা হলো, পবিত্র কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মতো ফেলে রেখো না। এতেই তোমাদের জীবন নিহিত। যারা কুরআনকে সম্মান করবে তারা উর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে।”

বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত সেবককে পবিত্র কুরআনের প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন, পবিত্র কুরআনের সুরক্ষার জন্য প্রেরণ করেছেন। তাঁকে সেসব তত্ত্বজ্ঞান শিখিয়েছেন যা মানুষের কাছে গোপন ছিল। তাঁর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের কল্যাণের এক ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন। তিনি এসেছেনই পবিত্র কুরআনের আইন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে এসব তথাকথিত আলেমের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এরপর কতিপয় সস্তা খ্যাতি প্রত্যাশীরাজনীতিবিদ এবং সরকারী কর্মকর্তারাও তাদের সাথে যোগ দেয় এবং আহমদীদেরকে বিভিন্ন অজুহাতে নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। বিগত কিছুদিন থেকে পুনরায় এরা পবিত্র কুরআনের বিকৃতি ও অবমাননার মনগড়া মামলায় আহমদীদেরকে জড়ানোর চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন আর যেসব আহমদীকে তারা এসব মিথ্যা ও নির্যাতনমূলক অভিযোগে বন্দি করে রেখেছে তাদের দ্রুত মুক্তিরও উপকরণ আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করুন।

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার আলোকেই পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ও গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে জানা যায় আর আহমদীয়া জামা'তই সেই জামা'ত যারা পৃথিবীতে এই কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে।

আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীদের এই মান অর্জন করা প্রয়োজন।

জগদ্বাসীকে জানানো প্রয়োজন, আমাদের বিরুদ্ধে যারা কুফরী ফতওয়া দেয় তাদের দেখানো উচিত যে, আহমদীরা কেবল অতীতের কল্পকাহিনীই বর্ণনা করে না বরং আজও জীবন্ত গ্রন্থ এবং জীবন্ত রসূলের অনুসারীদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার আশিসরাজি বর্ষণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। একথা বিশ্বাস রাখে যে, আজও আল্লাহ্ তা'লা কথা বলেন।

এটি সত্য কথা যে, অধিকাংশ মুসলমান পবিত্র কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু তবুও পবিত্র কুরআনের জ্যোতি ও আশিস এবং এর প্রভাব সর্বদা জীবন্ত এবং সজিব ও সতেজ রয়েছে। অতএব এখন আমি এটি প্রমাণের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। আর আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা যথাসময়ে নিজ বান্দাদেরকে স্বীয় সহায়তা ও সমর্থনের জন্য প্রেরণ করে আসছেন, কেননা তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ । অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা এই যিকর, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষাকারী। (সূরা হিজর: ১০)

“আমি পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলছি, কুরআন শরীফের যে কোনো বিষয়ই উপস্থাপন করবেন সেটিই নিজ অবস্থানে একটি নিদর্শন।”

“পবিত্র কুরআনের দৃষ্টি রয়েছে সমগ্র পৃথিবীর সংশোধনের ওপর আর এটি কোনো বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করে না। বরং সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, এটি সমগ্রমানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং সকলের সংশোধনই এর উদ্দেশ্য।”

খোদা তা'লা এই জামা'তকে এজন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যেন এটি ইসলামের সত্যতার জীবন্ত সাক্ষী হয় এবং প্রমাণ করে যে, সেসব কল্যাণ ও প্রভাব এ যুগেও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণে প্রকাশিত হয় যা তেরোশ বছর পূর্বে প্রকাশিত হতো।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৭ শে জানুয়ারী, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২৭ সুলাহ ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি বর্ণনা করছিলাম। সেই ধারাবাহিকতায় আজ আরো কিছু (উদ্ধৃতি) উপস্থাপন করব।

পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তীউপলক্ষ্যে 'তোহফায়ে কায়সারিয়া' নামক যে পু স্তিকা রচনা করেছিলেন, যাতে তিনি রানীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং ইসলামের তবলীগ করেছিলেন তাতে লেখেন,

“কুরআন গভীর প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ এবং প্রতিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে ইঞ্জিলের তুলনায় প্রকৃত পুণ্য শেখানোর ব্যাপারে অগ্রসর। বিশেষত সত্য ও অপরিবর্তনশীল খোদাকে দর্শনের প্রদীপ কুরআনের হাতেই রয়েছে। এটি যদি পৃথিবীতে না আসতো তবে আল্লাহ্ই জানেন, পৃথিবীতে সৃষ্টিপূজা কোন্ রূপ ধারণ করতো? তাই কৃতজ্ঞতা

প্রকাশের বিষয় হলো, খোদার একত্ববাদ যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।”

(তোহফায়ে কায়সারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ২৮২)

সে যুগে এমন কে ছিল যে এরূপ নির্বিকচিত্তে ভারত-সম্রাজ্ঞীকে এধরনের বার্তা পাঠিয়েছে বা ইসলামের তবলীগ করেছে?

ইসলাম ও কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার মতো সাহস যাদের মাঝে ছিল না তারাই আজ আমাদের সম্পর্কে বলে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বা আহমদীয়া জামা'ত কুরআন অবমাননা করছে, নাঊযুবিল্লাহ। অপরদিকে যারা অমুসলমান, তারা তাদের কর্মকাণ্ড দেখে ইসলামের বিরোধিতায় এতটা অন্ধ হয়ে গিয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্যের খণ্ডন তো করতে পারে না, তাই হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য কুরআন পুড়িয়ে নিজেদের অন্তর্জ্বালা মেটায়। যেভাবে সুইডেনে এমন ঘটনা ঘটছে, স্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে (মাঝে মধ্যেই) ঘটতে থাকে; সম্প্রতিও হয়েছে।

মুসলমানরা যদি যুগের ইমামকে মেনে নেয় এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুধাবন করে তা পালন করে তাহলে অমুসলমানদের এভাবে কুরআন অবমাননার দুঃসাহস আদৌ হতো না।

আল্লাহ তা'লাই এদের সুমতি দিন। এখন পবিত্র কুরআনই একমাত্র হেদায়েতের মাধ্যম- একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, ইসলাম এরূপ আশিসমণ্ডিত ও খোদাদর্শী এক ধর্ম যে, কেউ যদি প্রকৃত অর্থে এর অনুশীলন শিরোধার্য করে এবং এর শিক্ষামালা, নির্দেশাবলী ও ওসীয়্যতসমূহ বাস্তবায়ন করে যা খোদা তা'লার পবিত্র বাণী কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে তাহলে এই পৃথিবীতেই সে খোদাকে দেখতে পাবে। ”

মানুষ জিজ্ঞেস করে, পরকালে আল্লাহকে দেখতে হবে, সেটি কীভাবে দেখব?

তিনি (আ.) বলেন, যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পালন করো তাহলে এই জগতেই আল্লাহকে দেখতে পাবে। সেই খোদা, যিনি জগদ্বাসীর দৃষ্টি থেকে সহস্র সহস্র পর্দার অন্তরালে রয়েছেন, তাঁকে চেনার জন্য কুরআনের শিক্ষা ব্যতিরেকে আর কোনোই উপায় নেই! পবিত্র কুরআন যুক্তির নিরিখে ও ঐশী নিদর্শনের আলোকে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে খোদাতা'লা পর্যন্ত পৌছনোর পথ বাৎলে দেয়। (এর শিক্ষা পালন করলে এরূপ নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হবে যে, খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে।) তিনি (আ.) বলেন, “অধিকন্তু এতে (অর্থাৎ কুরআনে) এক প্রকার কল্যাণ ও আকর্ষণ শক্তি রয়েছে যা খোদান্বেষীদেরকে সর্বদা খোদার পানে আকৃষ্ট করে এবং জ্যোতি, শান্তি ও পরিতৃপ্তি দান করে। এছাড়া পবিত্র কুরআনের প্রতি সত্যিকার অর্থে ঈমান আনয়নকারী শুধুমাত্র দার্শনিকদের ন্যায় এই ধারণা পোষণ করে না যে, এই প্রজ্ঞাপূর্ণ জগৎ সৃষ্টিকারী কোনো এক সত্তা থাকা উচিত, বরং সে এক ব্যক্তিগত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে এবং এক পবিত্র দর্শন লাভ করে একীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করে যে, সত্যিকার অর্থেই সেই স্রষ্টা আছেন আর এই পবিত্র বাণীর জ্যোতি অর্জনকারী কেবলমাত্র শুষ্ক যুক্তিবিদদের মতো এই ধারণা পোষণ করে না যে, খোদা এক ও অদ্বিতীয়। বরং শত শত উজ্জ্বল নিদর্শনের মাধ্যমে যিনি তার হাত ধরে অমানিশা থেকে উদ্ধার করেন (তাঁকে) সে সত্যিকার অর্থেই দেখে নেয় যে, প্রকৃতপক্ষেই (নিজ) সত্তা ও গুণাবলীতে খোদা তা'লার কোনোই অংশীদার নেই। আর কেবল এতটুকুই নয়, বরং সে ব্যবহারিকভাবে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেয় যে, খোদাকে সে এরূপেই দেখে এবং খোদার তওহীদেরমাহাত্ম্য এমনভাবে তার হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে যায় যে, সে ঐশী অভিপ্রায়ের সামনে গোটা বিশ্বকে এক মৃত কীটের ন্যায়, বরং অকেজো বস্তু এবং একেবারে নিরর্থক জ্ঞান করে।”

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, খণ্ড-২১, পৃ: ২১, পৃ: ২৫-২৬)

পুনরায় পবিত্র কুরআনের জ্ঞানগত এবং কর্মের পূর্ণতার শিক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, পবিত্র কুরআনে জ্ঞান ও কর্মের চরম উৎকর্ষের শিক্ষা রয়েছে। (সম্পূর্ণ জ্ঞানে ভূষিত করা হয়েছে এবং ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।) তিনি (আ.) বলেন, বস্তুত اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ-এ জ্ঞানের উৎকর্ষের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনই সেই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যার শিক্ষা সঠিক পথের পানে নির্দেশনা প্রদান করে। আর কর্মগত ঔৎকর্ষ সম্পর্কে صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ-এ বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ (এর মাধ্যমে) পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ ফলাফল যেন অর্জিত হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেউন্নতির জন্য সেসব মানুষের পথে পরিচালিত হওয়ার দোয়া এতে রয়েছে যারা পুরস্কারপ্রাপ্ত। যাদের কথা গত জুমুআয় আমি উল্লেখ করেছিলাম, অর্থাৎ কারা পুরস্কারপ্রাপ্ত? (তারা হলেন) নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবংসালেহ গণ এবং তাদের দৃষ্টান্তও বিদ্যমান রয়েছে। আর এ যুগেও এমন মানুষ রয়েছেন যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, যাদেরকে আল্লাহ তা'লা পুরস্কারে ভূষিত করেন। তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে একটি রোপিত চারা পরিপুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাতে ফুলফল ধরতে পারে না সেভাবেই কোনো হেদায়েতের উন্নত ও উৎকর্ষ পূর্ণ ফলাফল বিদ্যমান না থাকলে সেই হেদায়েত মৃত হেদায়েত, যার মাঝে বিকশিত হওয়ার কোনো শক্তি ও সামর্থ্যনেই। যেভাবে কেউ বেদের শিক্ষার ওপর পরিপূর্ণ রূপে আমল করার পর এই আশা করতে না পারে যে, সে চিরস্থায়ী মুক্তি বা নাজাত লাভ করবে এবং কীটপত ঙ্গ হওয়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী সুখ লাভ করবে, তাহলে এই শিক্ষার লাভ কী? কিন্তু পবিত্র কুরআন শরীফ এমন এক হেদায়েত যে, এর অনুসারী উন্নত মানের উৎকর্ষ লাভ করে এবং খোদা তা'লার সাথে তার এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে ।

এমনকি তার পুণ্যকর্ম যা কুরআনের শিক্ষাসম্মত পন্থায় করা হয়ে থাকে তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এক পবিত্র বৃক্ষের উপমার ন্যায় বড় হতে থাকে এবং ফুলফল ধারণ করে আর এক বিশেষ ধরনের মিষ্টতা ও স্বাদ এতে সৃষ্টি হয়।”

এরপর তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ যা সেই সময় পৃথিবীতে এসেছিল যখন বড় বড় নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেক বিশ্বাসগত ও কর্মসংক্রান্ত ভুলভ্রান্তির প্রচলন হয়ে গিয়েছিল আর প্রায় সকল মানুষ অপকর্ম ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছেন, ***'যাহারাল ফাসাদু ফিল বিররে ওয়াল বাহার'***- অর্থাৎ সকল মানুষ, আহলে কিতাব হোক কিংবা অন্যরা- সবাই বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল এবং পৃথিবীতে চরম নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। (সূরা রাউম, আয়াত: ৪২) মোটকথা, এমন যুগে খোদা তা'লা সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডনের জন্য পবিত্র কুরআনের মতো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আমাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যাতে সকল ভ্রান্ত ধর্মের খণ্ডন বিদ্যমান রয়েছে। আরবিশেষভাবে সূরা ফাতিহা, যা পাঁচবেলার নামাযের প্রতি রাকাতেই পাঠ করা হয়, তাতে ইঙ্গিতস্বরূপ সকল বিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে। যেমনটি বলেছেন, ***'আল হামদো লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।'*** অর্থাৎ সমস্ত স্তুতি ও প্রশংসা সেই খোদার জন্য প্রযোজ্য যিনি সকল জগতের স্রষ্টা। ***'আর রহমান'*** তিনি এমন স্রষ্টা যিনি কারো কোনো কর্ম ছাড়াই সৃষ্টি করেন এবং কোনো কর্ম ছাড়াই দান করেন; তাঁর রহমানিয়্যত এভাবেই কাজ করে। ***'আর রহীম'***- তিনি কর্মের প্রতিফলদাতা। যে কর্ম করবে তার প্রতিদান দেন, দোয়া করলে তা গ্রহণ করেন। তিনি ***'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'*** -বিচার দিবসের মালিক, আর তাঁর শাস্তি ও পুরস্কারের (বিধান) এই ইহজগতেও আছে এবং পরকালেও আছে। তিনি (আ.) বলেন, এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গোটা বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষের বর্ণনা রয়েছে। ”

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩১-৩২)

মানুষ যদি অভিনিবেশের সাথে পাঁচবেলার নামাযে এটি পাঠ করে তাহলে অনেক বড় মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারবে।

পবিত্র কুরআন একটি মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন- এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন যে,মু'জিযা'র প্রকৃত মর্ম হলো, মু'জিযা এমন অলৌকিক নিদর্শনকে বলা হয় প্রতিপক্ষ যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে না। (কোনো দৃষ্টান্ত বা উপমা উপস্থাপন করতে পারে না।) যদিও সে বিষয়টি বাহ্যত মানবীয় সাধ্যের কাজ বলেই মনে হোক না কেন। যেমন পবিত্র কুরআনের মু'জিযা, যা আরবের সকল বাসিন্দার সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছিল। অতএব সেটি যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে মানবীয় শক্তিসামর্থ্যের অন্তর্গত বলেই মনে করা হচ্ছিল, কিন্তু এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে আরবের সকল বাসিন্দা ব্যর্থ হয়।কাজেই মু'জিযার তাৎপর্য বোঝার জন্য পবিত্র কুরআনের বাণী অত্যন্ত উজ্জ্ ল দৃষ্টান্ত । অর্থাৎ বাহ্যত এটিও একটি বাণী যেভাবে মানুষের কথা বা বাণী হয়ে থাকে, কিন্তু এটি স্বীয় বাগ্মিতাপূর্ণ বর্ণনার নিরিখে এবং ভাষার মাধুর্য , সুস্পষ্টতা এবং সুন্দর অর্থবহ বাক্যের দিক দিয়ে যা কিনা সর্বত্র সত্য এবং প্রজ্ঞা বজায় রাখে, এছাড়া অত্যন্ত উজ্জ্বল দলিলপ্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে যা কিনা সমগ্র বিশ্বের বৈরী দলিলপ্রমাণের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে, অধিকন্তু বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর নিরিখে এমন এক অতুলনীয় মু'জিযা যার মোকাবিলা তেরোশ বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো বিরুদ্ধবাদী করতে পারে নি আর কারো তা করার শক্তিও নেই। পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে পবিত্র কুরআনের এই স্ব তন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত যে, এটি অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকেও মু'জিযাপূর্ণ বাক্যাবলীতে বর্ণনা করেছে যা উচ্চ মার্গের বাগ্মিতাপূর্ণ এবং সত্য ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। মোটকথা, মু'জিযার প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য হলো, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অথবা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে একটি পার্থক্য প্রদর্শন করা। আর এমন স্বতন্ত্র বা পার্থক্যসূচক বিষয়ের নাম হলো মু'জিযা বা অন্য কথায় নিদর্শন। নিদর্শন এমন এক অপরিহার্য বিষয় যা ব্যতীত খোদা তা'লার অস্তিত্বের ওপরও পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয়, আর না সেই ফল লাভ করা সম্ভব যা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের আলোকে লাভ হতে পারে। এটি জানা কথা যে, ধর্মের প্রকৃত সত্যতা খোদা তা'লার অস্তিত্বের পরিচয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

সত্য ধর্মের অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির মধ্যে এটি আবশ্যক বিষয় যে, তাতে এমন নিদর্শন পাওয়া যাবে যা খোদা তা'লার অস্তিত্বে'র অকাট্য এবং সুনিশ্চিত প্রমাণ প্রদান করে।আর সেই ধর্ম নিজের মধ্যে এমন জোরালো শক্তি রাখে যা এর অনুসারীদের হাত খোদা তা'লার হাতের সাথে মিলিয়ে দেয়।”

আল্লাহর সাথে এমন (নিবিড়) সম্পর্ক গড়ে দেয়।।....."শুধু মাত্র সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রয়োজন অনুভব করা এবং তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জিত না হওয়া- এটি পরিপূর্ণরূপে খোদাকে চেনার জন্য যথেষ্ট নয়। কেবল এতটুকু জানা যে, একজন সৃষ্টিকারী আছেন- এতটুকুই যথেষ্ট নয়।

"আর এখানেই যারা আটকে থাকে তারা খোদা তা'লার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না আর স্বীয় আত্মাকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পবিত্রও করতে পারে না। শুধু এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা যে, কোনো একজন (স্রষ্টা) আছেন- এতে তো আত্মার পরিশুদ্ধি হতে পারে না কিংবা আল্লাহ তা'লার সাথেও সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে না। এ থেকে যদি কিছু অনুধাবন করা যায় তাহলে তা কেবল এতটুকুই যে, এই সুদৃঢ় এবং পরিপূর্ণ ও নিখুঁত সৃষ্টির একজন স্রষ্টা থাকা উচিত; সেই স্রষ্টা যে প্রকৃতই আছেন- তা নিশ্চিত হওয়া যায় না! অর্থাৎ এই বিশ্ব জগত এবং পৃথিবীতে যা কিছুই আমরা দেখতে পাই তার কোনো সৃষ্টিকর্তাও আছে- এই প্রকৃত জ্ঞানও থাকা উচিত। আর যখন এই জ্ঞান থাকবে যে, তিনি কে আর আমরা যে খোদার ইবাদত করি তিনিই সেই খোদা- তখনই প্রকৃত সম্পর্কও সৃষ্টি হয়; তখনই আল্লাহ তা'লার নির্দেশাবলী পালনের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর মানুষ নিজ আত্মার সংশোধনের প্রতিও দৃষ্টি দেয়।

তিনি বলেন, "একথা স্পষ্ট যে, কেবল প্রয়োজনকে অনুভব করা একটি ধারণা মাত্র, যা দর্শনের বিকল্প হতে পারে না, আর দর্শনের পবিত্র ফলাফলও তাতে সৃষ্টি হতে পারে।" [কোনো কিছু ধারণা করা আর দেখার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে।] অতএব যে ধর্ম মানুষের খোদার পরিচয় লাভকে কেবলমাত্র 'থাকা উচিত'-এর অসম্পূর্ণ স্তর পর্যন্তই ছেড়ে দেয় তা তার ব্যবহারিক অবস্থার চিকিৎসক নয়। অতএব বাস্তবিক অর্থে এমন ধর্ম হলো এক মৃত ধর্ম যার কাছে কোনো পবিত্র পরিবর্তনের আশা করা এক দুরাশা মাত্র। জানা কথা যে, কেবল যৌক্তিক প্রমাণাদি ধর্মের সত্যতার জন্য পরিপূর্ণ সাক্ষ্য হতে পারে না আর এটি এমন মোহর নয় যে, কোনো প্রতারক তা বানাতে সমর্থ হবে না, বরং এটি যুক্তির সার্বজনীন প্রস্রবণের এক রিক্ততা বিবেচিত হবে।" [শুধু যৌক্তিক প্রমাণ তো উপস্থাপন করা যেতে পারে অথবা যুক্তির ভিত্তিতে কেউ অনেক বড় কথাও বলতে পারে; কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না আল্লাহ তা'লার গুণাবলীকে মানুষ জানবে এবং সেগুলো দ্বারা উপকৃত হবে।]

তিনি বলেন, "এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত কে দেবে যে, যৌক্তিক কথা যা এক গ্রন্থে লেখা হয়েছে সেগুলো আসলে এলহামী নাকি অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে চুরি করে লেখা হয়েছে? যদি ধরেও নেয়া হয় যে, সেগুলো চুরি করা নয়, তবুও আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বের বিষয়ে সেগুলো কীভাবে অকাট্য দলিল হতে পারে আরকোনো সত্য সন্ধানীর হৃদয় কীভাবে এর মাধ্যমে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে যে, কেবল সেসব যৌক্তিক কথাই নিশ্চিতভাবে খোদা দর্শনের দর্পণ হতে পারে? আর কীভাবে এই স্বস্তিও লাভ হতে পারে যে, সেসব কথা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্তি থেকে মুক্ত? [অর্থাৎ সেগুলো এমন নিদর্শন যা আল্লাহ তা'লার পানে নিয়ে যায় অথবা সকল প্রকার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত।] অতএব যদি ধর্ম কেবল কিছু কথাকে যুক্তি বা দর্শনের প্রতি আরোপ করে নিজ সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে আর ঐশী নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়াদি প্রদর্শনে সমর্থ না হয় তাহলে এমন ধর্মের অনুসারী প্রতারণার শিকার বা প্রতারিত আর সে অন্ধকারেই মৃত্যু বরণ করবে। মোটকথা শুধুমাত্র যৌক্তিক প্রমাণাদি দ্বারা তো খোদা তা'লার অস্তিত্বও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে পারে না, কোনো ধর্মের সত্যতা এর মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া দূরে থাক ! আর যতক্ষণ কোনো ধর্ম এই কথার দায়িত্ব গ্রহণ না করবে যে, তা খোদা তা'লার সত্তাকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে দেখাবে ততক্ষণ সেই ধর্ম কোনো মূল্য রাখে না। আর সেই মানুষ হতভাগা যে এমন ধর্মের প্রেমিক। সেই ধর্ম নিজ ললাটে অভিশাপের কলঙ্ক বয়ে বেড়ায় যা মানুষের প্রজ্ঞাকে সেই স্তরে উপনীত করতে পারে না যার মাধ্যমে সে খোদার দর্শন লাভ করতে পারে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ৫৯-৬১)

অতএব এটি হলো সেই স্তর যা আমাদের অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত।

অর্থাৎ খোদা তা'লাকে চেনা এবং নিদর্শনের মাধ্যমে চেনা, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে চেনা, কেবল যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে নয়। আর এরপর খোদা তা'লার যে স্বরূপ মানুষের সামনে উন্মোচিত হয় তা হলো বাস্তব (স্বরূপ)।

আল্লাহ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামা'তের মাঝে এমন উদাহরণ রয়েছে যে, বিধর্মী বরং ধর্মহীন এবং খোদা তা'লাকে যারা মানে না- তাদের মাঝেও খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস সৃষ্টি করা হয়েছে; যৌক্তিক প্রমাণ দেয়া হয়েছে আর এরপর যখন নিদর্শন দেখানো হয়েছে আর (এ সংক্রান্ত) ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তখন তারা ধর্মকেও মেনেছে আর ইসলামকেও মেনে নিয়েছে। এখানে পাশ্চাত্যেও এমন লোক রয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বেলজিয়ামের এক বন্ধু ছিলেন যিনি নাস্তিক ছিলেন। মূলত তিনি ইন্দোনেশিয়ান, পরবর্তীতে বেলজিয়ামে এসে স্থায়ী হয়েছেন। তিনি বয়আত করেন এবং আমাকে তিনি স্বয়ং বলেছেন যে, আমি যখন খোদা তা'লার অস্তিত্বকে স্বীকার করি, শুধু যৌক্তিক দিক থেকে নয়, বরং বাস্তব প্রমাণের ভিত্তিতে আর নিদর্শনের মাধ্যমে, তখন আমার জন্য আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে স্বীকার না করার কোনো উপায় ছিল না। তিনি বলেন, আর যেহেতু আহমদীয়াত আমাকে উক্ত পথ দেখিয়েছে তাই আমি আহমদী মুসলমান হয়েছি।

অতঃপর পবিত্র কুরআন এই দাবি করে যে, এটি মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েতস্বরূপ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, "এই আয়াতসমূহে যে প্রজ্ঞাপূর্ণ দিক লুক্কায়িত আছে তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন: ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ এটি সেই কিতাব যা খোদা তা'লার জ্ঞানসহ প্রকাশিত হয়েছে। আর যেহেতু তাঁর জ্ঞান অজ্ঞতা এবং ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত, [অজ্ঞতা ও ভুলত্রুটিমুক্ত,] তাই এই কিতাব সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান মানবের পূর্ণতার জন্য নিজের মাঝে একটি পরিপূর্ণ শক্তি বহন করে, তাই এই কিতাব মুত্তাকীদের জন্য একটি পরিপূর্ণ পথনির্দেশনা। আর তাদেরকে সেই স্তরে উপনীত করে যা মানুষের স্বভাবজ উন্নতির চূড়ান্ত স্তর।অতঃপর মুত্তাকী কারা যারা হেদায়েত লাভ করে- এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লা এই আয়াতসমূহে বলেছেন, মুত্তাকী হলো তারা যারা অদৃশ্য খোদার প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং নামায কায়েম করে আর নিজ ধনসম্পদ থেকে কিছুটা খোদার রাস্তায় খরচ করে। অধিকন্তু পবিত্র কুরআন এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনে। তারাই হেদায়েতের শীর্ষে রয়েছে এবং তারাই পরিত্রাণ লাভ করবে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ১৩৬-১৩৭)

এটি হলো মুত্তাকীর সংজ্ঞা।

অতঃপর পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ হওয়ার বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, "এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, কুরআন শরীফ ধর্মকে পরিপূর্ণ করার সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। যেমনটি তা নিজেই ঘোষণা করে যে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং স্বীয় নেয়ামত তোমাদের জন্য পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব পবিত্র কুরআনের পর কোনো কিতাবের আসার সুযোগ নেই, কেননা মানুষের যা কিছু প্র য়োজন ছিল তার সবই পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে দিয়েছে। এখন কেবল ঐশী বাক্যালাপের দরজা খোলা রয়েছে আর তা -ও স্বাধীনভাবে নয়, বরং সত্য এবং পবিত্র বাক্যালাপ যা স্পষ্ট ও প্রকাশ্যরূপে ঐশী সাহায্যের রং নিজের মাঝে ধারণ করে আর অগণিত অদৃশ্য বিষয় সংবলিত হয়ে থাকে, তা আত্মশুদ্ধির পর কেবল পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৮০)

পরিতাপ যে, আমাদের বিরোধীরা এসব প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনতে চায় না এবং আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ, আমরা পবিত্র কুরআনকে বিকৃত করেছি। পবিত্র কুরআনের আধ্যাত্মিক চিকিৎসা হওয়ার বিষয়ে তিনি (আ.) তাঁর চশমায়ে মা'রেফাত পুস্তকে বলেন, পবিত্র কুরআন এমন এক প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ যা আধ্যাত্মিক চিকিৎসার সমস্ত নীতিকে অর্থাৎ ধর্মের নিয়মাবলীকে, যা মূলত আধ্যাত্মিক চিকিৎসা, দৈহিক চিকিৎসার সমস্ত নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে। [অর্থাৎ সেটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আখ্যা দিয়েছে।] আর এই সমতা বিধান এতই সূক্ষ্ম যা শত শত সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচনের দ্বার। আর পবিত্র কুরআনের সত্য ও পরিপূর্ণ তফসীর সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে দৈহিক চিকিৎসার সমস্ত নীতিকে দৃষ্টিপটে রেখে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নিয়মনীতির প্রতি দৃষ্টি দেয়। তিনি (আ.) বলেন, একবার আমাকে কয়েকজন গবেষক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কিছু বই কাশফে দেখানো হয়। [অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পথনির্দেশনা দান করেন; কতক চিকিৎসকের লেখা বইপত্র কাশফে দেখানো হয়] যেগুলো দৈহিক চিকিৎসার সমস্ত নীতি, জ্ঞান সংক্রান্ত নিয়মনীতি এবং (মানবদেহের) ছয়টি তন্ত্র ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় সমৃদ্ধ ও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। [অর্থাৎ সে সম্পর্কিত ছিল।] এগুলোর মাঝে অভিজ্ঞ ডাক্তার কারশীর পুস্তকও ছিল। [অর্থাৎ এগুলোর মাঝে একটি পুস্তক কারশীর ছিল যিনি একজন প্রসিদ্ধ হাকীম ছিলেন।] আর এদিকে ইশারা করা হয় যে, এটিই কুরআনের তফসীর। এ থেকে জানা গেল যে, শারীরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের মাঝে অত্যন্ত গভীর ও প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে এবং একটি অপরটির সত্যায়নকারী। শারীরিক চিকিৎসার যেসব পুস্তক ছিল সেগুলো সামনে রেখে আমি যখন পবিত্র কু রআনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শারীরিক চিকিৎসার সমস্ত নীতির কথা অত্যন্ত প্রাঞ্জলরূপে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান পেয়েছি।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১০২-১০৩)

[অর্থাৎ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্যও পবিত্র কুরআন থেকে সঠিক সাহায্য পাওয়া যায়। এছাড়া এক্ষেত্রে প্রণিধান করার জন্য, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যুগ-ইমামের কথাগুলো শোনা আবশ্যক, তাঁর রচনাবলী পাঠ করা আবশ্যক।]

পবিত্র কুরআনই তাআল্লুক বিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রকৃত মাধ্যম- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

"স্মরণ রেখো! পরম মার্গের অদৃশ্য খোদাকে মানুষ কোনোক্রমেই স্বীয় শক্তিবলে শনাক্ত করতে পারে না যতক্ষণ না তিনি স্বয়ং নিজ সত্তাকে নিজের বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে চিনিয়ে না দেন। আর খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক আদৌ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সম্পর্ক বিশেষভাবে খোদা তা'লার মাধ্যমে সৃষ্টি না হয় এবং প্রবৃত্তিগত অপবিত্রতা ও ময়লা আবর্জনা কোনোক্রমেই প্রবৃত্তি থেকে দূর হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ থেকে একটি জ্যোতি হৃদয়ে প্রবেশ না করে। দেখো! আমি এই চাক্ষুস সাক্ষ্য উপস্থাপন করছি যে, পবিত্র কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল সেই সম্পর্ক লাভ হয়ে থাকে। অন্য কোনো কিতাবেই এখন আর প্রাণের স্পন্দন নেই এবং আকাশের নীচে কেবল একটিমাত্র কিতাবই অবশিষ্ট রয়েছে যা সেই সত্যিকার প্রেমাস্পদের চেহারা প্রদর্শন করে, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন।"

(হাকীকতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২)

অতএব পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মেনে কাজ করলে খোদা তা'লার চেহারা দেখা সম্ভব।

আমাদের আহমদীদের জন্যও এটি চিন্তার বিষয়। আমরা কতজন আছি যারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করি, গভীর মনোযোগের সাথে দেখি ও পড়ি? এজন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরো বলেন, আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী পুণ্যবান লোকদের স্বচক্ষে দেখা ঘটনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণ যা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ পদক্ষেপে সম্পন্ন হয় তাতে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, ধীরে ধীরে একঅদ্বিতীয় খোদার ভালোবাসা হৃদয়ে প্রথিত হয়ে যায়। এছাড়া ঐশী কালামের আধ্যাত্মিক শক্তি মানবাত্মাকে এক নূর বা জ্যোতি দান করে যার মাধ্যমে তার চোখ খুলে যায় আর অবশেষে সে পরজগতের অলৌকিক নির্দশনসমূহ দেখতে পায়। অতএব সেদিন থেকে সে জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বাসের মাধ্যমে বুঝতে পারে, খোদা আছেন। আর এরপর এ বিশ্বাস উন্নতি করতে থাকে ও এভাবে জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বাস থেকে চাক্ষুস বিশ্বাসের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর এরপর চোখে দেখা বিশ্বাস অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনে সে প্রথমে কোনো আত্মিক পবিত্রতা লাভ করে না আর সে অনেক ধরনের পাপে লিপ্ত থাকে। এরপর খোদা তাঁর অনুগ্রহের হাত তার দিকে প্রসারিত করেন এবং বিভিন্ন অলৌকিক পন্থায় তার ঈমানকে শক্তিশালী করা হয় আর যেভাবে পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (সূরা ইউনুস: ৬৫) অর্থাৎ ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়- অনুরূপভাবে সে-ও নিজের সত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সুসংবাদ পেতে থাকে, এবং এসব সুসংবাদের ফলে যেমন একদিকে তার ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে তেমনিভাবে সে পাপ এড়িয়ে চলে এবং পুণ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪২৩-৪২৪)

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ যা আর্যদের এক সভায় পড়া হয়েছিল তাতে পবিত্র কুরআনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "সুস্থ বিবেক যেটিকে এলহামী কিতাব চেনার জন্য স্বতন্ত্র নিদর্শন আখ্যা দিয়েছে তা কেবল খোদা তা'লার পবিত্র কিতাব কুরআন শরীফে বিদ্যমান। আর এ যুগে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য যা খোদার কিতাবের অনন্য নিদর্শনরূপে থাকা উচিত তা অন্যান্য কিতাবে নিশ্চিতভাবে নেই। হতে পারে কোনো এক কালে এগুলোতে সেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। আর যদিও আমরা একটি দলিলের ভিত্তিতে সেগুলোকে এলহামী কিতাব মনে করি যা আমরা ইতঃপূর্বে লিখেছি, কিন্তু সেগুলো এলহামী হলেও বর্তমান অবস্থার নিরিখে পুরোপুরি অকেজো এবং সেই রাজকীয় দুর্গের ন্যায় যা খালি ও জনমানবহীন হয়ে পড়ে আছে আর সকল ধনসম্পদ ও সেনাশক্তি তা থেকে হারিয়ে গেছে।"

এছাড়া আরো অনন্য বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "এখন আমি পবিত্র কুরআনের এমন সব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা নিম্নে বর্ণনা করব যা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। এক নম্বর হলো এতে এক অসাধারণ শক্তি রয়েছে যা এর অনুসারীদের অনুমাননির্ভর তত্ত্বজ্ঞানের পর্যায় থেকে নিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।"

[কেবল অনুমান নয় বরং নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞান নিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়।] আর সেটি হলো, একজন মানুষ যখন পূর্ণরূপে এর অনুসরণ করে তখন ঐশী শক্তির দৃষ্টান্ত নিদর্শনরূপে তাকে দেখানো হয় এবং খোদা তার সাথে কথোপকথন করেন আর নিজ বাণীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়ে তাকে অবগত করেন। পবিত্র কুরআনের এসব কল্যাণকে আমি কল্পকাহিনী হিসেবে বর্ণনা করি না, বরং আমি সেসব অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়ে থাকি যা স্বয়ং আমাকে দেখানো হয়েছে। সেই সবগুলো নির্দশনের সংখ্যা প্রায় এক লাখ বরং সেগুলো সম্ভবত এক লাখেরও অধিক হবে। খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আমার এই বাণীর অনুসরণ করবে সে কেবল এই কিতাবের বিভিন্ন নিদর্শনের ওপরই ঈমান আনবে না বরং তাকেও নিদর্শনাবলী দেয়া হবে। অতএব আমি নিজে খোদার বাণীর প্রভাবে সেসব নিদর্শন পেয়েছি যা মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে আর কেবলই আল্লাহ্ তা'লার কাজ। সেই ভূমিকম্প যা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে, সেই প্লেগ যা পৃথিবীকে গ্রাস করছে- সেগুলো এসব নিদর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত যা আমাকে দেওয়া হয়েছে।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪০২-৪০৩)

তিনি (আ.) বলেন, এসব নির্দশন আমার নয় বরং পবিত্র কুরআনের, কেননা আমি এ কাজ এরই শক্তি এবং এরই দেওয়া প্রেরণায় করছি।

"বস্তুত পবিত্র কুরআনের বলিষ্ঠ শক্তিগুলোর একটি শক্তি হলো, এর অনুসারীকে বিভিন্ন নিদর্শন ও অলৌকিকতা দান করা হয় আর সেগুলো এত বেশি হয় যে, পৃথিবী এর মোকাবিলা করতে পারে না।

অতএব আমি এ দাবিই করছি এবং বজ্রকণ্ঠে বলছি যে, পৃথিবীর সকল বিরোধী, তারা প্রাচ্যেরই হোক বা পাশ্চাত্যেরই হোক, সবাই যদি একটি মাঠে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন ও মু'জিযা (প্রদর্শনের) ক্ষেত্রে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় তাহলে আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁর প্রদত্ত সামর্থ্য দিয়ে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী হব। আর এই বিজয় এজন্য অর্জিত হবে না যে, আমার আত্মায় শক্তির পরিমাণ কিছুটা বেশি রয়েছে; বরং এ কারণে হবে যে, খোদা তা'লা চেয়েছেন আমি যেন তাঁর বাণী পবিত্র কুরআনের বলিষ্ঠ শক্তি এবং তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর আধ্যাত্মিক শক্তি ও সুউচ্চ পদমর্যাদার প্রমাণ উপস্থাপন করি, আর তিনি আমার কোনো যোগ্যতাবলে নয় বরং শুধুমাত্র নিজ কৃপাগুণে আমাকে এই সৌভাগ্য দিয়েছেন যে, আমি তাঁর সুমহান নবী ও তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী বাণীর অনুসরণ করি এবং তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করি, আর আমি খোদার সেই বাণীর প্রতি ঈমান রাখি যার নাম কুরআন শরীফ আর যা ঐশী শক্তিমত্তার বিকাশস্থল। এছাড়া পবিত্র কুরআনে এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (ইউনুস: ৬৫) এবং এ প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ (মুজাদালা: ২৩) আর এ প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا (আনফাল: ৩০)- এসব প্রতিশ্রুতি অনুসারেই খোদা আমাকে এসব দান করেছেন। এসব আয়াতের অনুবাদ হলো, যারা পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে তাদেরকে সত্যস্বপ্ন ও এলহাম দেওয়া হবে; অর্থাৎ অনেক বেশি দেওয়া হবে, অন্যথায় ব্যতিক্রম হিসেবে তো অন্যরাও সত্যস্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু এক সমুদ্রের সাথে একটি বিন্দুর কোনো তুলনা হয় না এবং এক ধনভাণ্ডারের সাথে একটি পয়সার কোনো সাদৃশ্য চলে না। এরপর বলেন, পূর্ণ অনুসারীকে রূহুল কুদু স (ফেরেশতা) দ্বারা সাহায্য করা হবে, অর্থাৎ তার জ্ঞানবুদ্ধি অদৃশ্য থেকে একপ্রকার জ্যোতি লাভ করবে আর তাদের কাশফী অবস্থা একান্ত স্বচ্ছ করা হবে আর তাদের কথা ও কাজে প্রভাব সৃষ্টি করা হবে এবং তাদের ঈমান অত্যন্ত সুদৃঢ় করা হবে। আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে আর অন্যদের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে দিবেন , অর্থাৎ সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান যা তাদেরকে দেয়া হবে আর যে অলৌকিক নিদর্শন তারা লাভ করবে এর বিপরীতে অন্য সকল জাতি ব্যর্থ থাকবে। তিনি (আ.) বলেন, অতএব আমরা দেখেছি যে, আদিকাল থেকে খোদা তা'লার এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে এসেছে আর এ যুগে আমরা নিজেরাও এর চাক্ষুস সাক্ষী।"

মুসলমানরাও এটি কিছুটা বুঝতে সমর্থ হত আর আর আমরাও এর সঠিক জ্ঞান লাভ করতাম যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছেন আর সেই নিদর্শনের ধারা আজও অব্যাহত আছে।

" আর যে-ই সঠিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার বাণী (কুরআন)-এর অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে এর কিছু না কিছু স্বাদ আস্বাদন করাতে থাকেন।তিনি (আ.) আরো বলেন, আমি তো পবিত্র কুরআনের মহান শক্তির উল্লেখ করলাম যা নিজ অনুসরণকারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু এটি (তথা কুরআন) অন্যান্য অলৌকিক নিদর্শন দ্বারাও পরিপূর্ণ। কুরআন ইসলামের উন্নতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বিজয়ের সংবাদ সেই সময় দিয়েছে যখন মহানবী (সা.) মক্কার মরু অঞ্চলে একাকী ঘুরে বেড়াতেন আর তাঁর সাথে কতিপয় দরিদ্র এবং দুর্বল মুসলমান ছাড়া আর কেউ ছিল না। আর রোমান সম্রাট যখন ইরানীদের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং পারস্যসম্রাট তার সাম্রাজ্যের একটি বড় অংশ দখল করে নেয় তখনও কুরআন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, নয় বছরের মধ্যে পুনরায় রোমান সম্রাট বিজয়ী হবে আর

ইরানকে পরাস্ত করবে। বস্তত এমনটিই ঘটেছিল। তেমনিভাবেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের মহান নিদর্শন যা কিনা ঐশী শক্তির পরিচায়ক- এর কথাও পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আছে যে, মহানবী (সা.)-এর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং কাফেররাও এই অলৌকিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে।

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪০৯-৪১১)

এসকল বিষয় বিস্তারিতভাবে তাঁর (আ.) পুস্তক 'চশমায়ে মা'রেফাত'-এ উল্লিখিত আছে। আমি যৎসামান্য উল্লেখ করছি।

পবিত্র কুরআনের কাহিনীগুলো মূলত ভবিষ্যদ্বাণী- এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে পুনরায় 'চশমায়ে মা'রেফাত' পুস্তকে তিনি (আ.) বলেন: "পবিত্র কুরআনে যতটা কাহিনী আছে, সেগুলো মূলত কাহিনী নয় বরং তা হলো ভবিষ্যদ্বাণী যা গল্প আকারে বর্ণিত হয়েছে।

"তবে হ্যাঁ, তওরাতে এগুলো শুধুই গল্পকাহিনী হিসেবে পাওয়া যায়, কিন্তু পবিত্র কুরআন প্রত্যেক ঘটনাকে মহানবী (সা.) এবং ইসলামের জন্য এক ভবিষ্যদ্বাণী আখ্যা দিয়েছে আর এই কাহিনীসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও পরম স্বচ্ছতার সাথে পূর্ণ হয়েছে। মোটকথা পবিত্র কুরআন তত্ত্বজ্ঞানের এক সমুদ্র আর ভবিষ্যদ্বাণীর এক মহাসাগর এবং এটি কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে, কোনো মানুষ পবিত্র কুরআন ব্যতিরেকে পূর্ণরূপে খোদা তা'লার প্রতি ঈমান আনতে পারে। কেননা এই বিশেষত্ব বিশেষভাবে পবিত্র কুরআনেরই রয়েছে, অর্থাৎ এর পূর্ণ অনুসরণে খোদা আর বান্দার মাঝে যে আচ্ছাদন অন্তরায় হিসেবে রয়েছে তা পরিপূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যায়। অন্য ধর্মের অনুসারীরা কেবল গল্প আকারে খোদা তা'লার নাম স্মরণ করে, কিন্তু পবিত্র কুরআন সেই সত্যিকার প্রেমাস্পদের চেহারা দেখিয়ে দেয় আর বিশ্বাসের জ্যোতি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়, আর সেই খোদা যিনি সমগ্র বিশ্ব থেকে গুপ্ত ছিলেন তিনি শুধুমাত্র কুরআন শরীফের মাধ্যমেই প্রকাশিত হন।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ২৭১-২৭২)

শর্ত হলো, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রকৃত অর্থেই পালন করতে হবে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, " পবিত্র কুরআনের দুটি অংশ বিদ্যমান, একটি হলো ঘটনাবলী আর অপর অংশ বিধিবিধান। কোনো বিষয় গল্পের আকারে হয়ে থাকে আর কিছু অংশ শরীয়তের বিধান হিসেবে হয়ে থাকে। যারা ঘটনাবলী এবং শরীয়তের বিধানের মাঝে পার্থক্য করে না তাদেরকে অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। আর তারা পবিত্র কুরআনে স্ববিরোধ সাব্যস্ত করার কারণ হয়ে থাকে, যেন নিজের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কুরআন শরীফকে খুইয়ে বসে। কেননা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন, لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (সূরা নিসা-৮৩) অর্থাৎ এটি যদি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে অবশ্যই এতে অনেক স্ববিরোধ পাওয়া যেতো। স্ববিরোধনা থাকা এর আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেহেতু কুরআনে কোনো স্ববিরোধ নেই তাই এটি (সুনিশ্চিত) আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু এই অপরিণামদর্শীরা ঘটনাবলী এবং শরীয়তের মাঝে পার্থক্য না করার কারণে এতে স্ববিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে (প্রকারান্তরে) সাব্যস্ত করে- এটি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো রচনা। পরিতাপ- কী বুদ্ধি এদের! "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৩)

[যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী আর অন্যগুলো বিধি-বিধান। এগুলো যদি কেউ গুলিয়ে ফেলে তাহলে তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। তাদের নিজেদের এসব বুঝার মতো তত্ত্বজ্ঞান নেই, আর যে তফসীর করা হয় তখন এর ওপর বিকৃতির অপবাদ আরোপ করে।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সুমহান সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"পবিত্র কুরআনের অসাধারণ গুণাবলীর মাঝে এর শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা সেটি মানব প্রকৃতি এবং মানবীয় প্রয়োজনের একেবারে উপযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, তওরাতের শিক্ষা হলো দাঁতের বদলে দাঁত এবং চোখের বদলে চোখ। আর ইঞ্জিল বলে, কখনোই অন্যায়ের মোকাবিলা করো না, বরং যদি কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তাহলে অপর গালও পেতে দাও। কিন্তু কুরআন বলে جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ (সূরা শুরা-৪১), অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি ততটুকুই যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি নিজ অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে এবং এই অপরাধ ক্ষমা করার ফলে অপরাধীর সংশোধন হয় এবং ভবিষ্যতে নিজ পাপ থেকে বিরত হয় তাহলে ক্ষমা করা প্রতিশোধ গ্রহণের চেয়ে উত্তম, নতুবা শাস্তি দেয়া উত্তম। মানব প্রকৃতি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে ; কেউ কেউ এমন রয়েছে যাদেরকে ক্ষমা করলে সেই পাপের নামও আর নেয় না এবং বিরত হয়। তবে এমনও কিছু রয়েছে যারা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েও পুনরায় সেই অপকর্ম করে। মানব প্রকৃতি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এজন্য এই শিক্ষাই যথোপযুক্ত যা পবিত্র কুরআন উপস্থাপন করেছে। তওরাত এবং ইঞ্জিলের শিক্ষা কখনোই পরিপূর্ণ নয়। বরং সেসব শিক্ষা মানবীয় বৃক্ষের শাখাগুলোর মাঝে শুধুমাত্র একটি শাখার সাথে সম্পর্ক রাখে। আর সেই উভয় শিক্ষাই উক্ত বিধানের অনুরূপ যা নির্দিষ্ট জাতি বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা সব রকম মানব প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখে।"

এই উদাহরণ আমি পূর্বের খুতবাতেও বর্ণনা করেছিলাম, কিন্তু ভিন্ন আঙ্গিকে করেছিলাম। এখন পবিত্র কুরআনের গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে এই উদাহরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

শুধু এই দৃষ্টান্তই দেন নি বরং অন্যান্য দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। যেমন তিনি (আ.) বলেন, "ইঞ্জিলের শিক্ষা" , তুমি পর নারীর দিকে কামলোলুপ দৃষ্টিতে দেখো না। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে, তুমি কখনোই দেখো না, কামবাসনা নিয়েও নয় আর কামবাসনাহীন দৃষ্টিতেও নয়; কেননা এটি কোনো একসময় তোমার জন্য পদস্খলনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। [এটি বলে থাকে যে, আমরা অত্যন্ত পবিত্র দৃষ্টিতে দেখছি; পবিত্র দৃষ্টিতেও দেখবে না, কেননা এটি তোমাদের জন্য পদস্খলনের কারণ হবে।] বরং প্রয়োজনের সময় ছানাবড়া চোখে তাকিয়ে নয়, বরং দৃষ্টি অর্ধউন্মিলিত রেখে কাজ চালিয়ে নেওয়া উচিত। [অর্থ াৎ যদি প্রয়োজন পড়েও তখন আধবোজা চোখে তাকাও যেন পুরোপুরি দৃষ্টিতে না পড়ে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিও না; (আর তা-ও) একান্তই তাকানোর প্রয়োজন পড়লে।] তিনি (আ.) বলেন, ইঞ্জিল বলে, নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচার না করলে তালাক দে বে না, কিন্তু পবিত্র কুরআন এ বিষয়ে পরিস্থিতির যৌক্তিকতা দেখে। কারণ তালাক কেবল ব্যভিচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বরং যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায় আর কোনোভাবেই বনিবনা না হয় কিংবা যদি প্রাণনাশের আশংকা থাকে অথবা স্ত্রী ব্যভিচারিনী না হলেও ব্যভিচারের পূর্ববর্তী কার্যকলাপ তার দ্বারা যদি প্রকাশ পায় এবং পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করে- তাহলে এমন সব ক্ষেত্রে স্বামীকে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, যদি সে সমীচীন মনে করে তাহলে (স্ত্রীকে) পরিত্যাগ করতে পারে। তবে তা সত্ত্বেও নিদের্শনা রয়েছে বরং কঠোর নির্দেশনা রয়েছে;[তালাক দেওয়া এত সহজ নয়;] তিনি (আ.) বলেন, নিদের্শনা রয়েছে বরং কঠোর নির্দেশনা রয়েছে যেনতালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে। [এখানে এ বিষয়েরও উত্তর রয়েছে যে, অনেক পুরুষের ধারণা হলো- পুরুষের তালাক দেওয়ার ঢালাও অধিকার রয়েছে, আর তারা এর অন্যায় ব্যবহার করে থাকে এবং বাড়াবাড়িও করে।] তিনি বলেন, উপযুক্ত কারণ ছাড়া তো এমনিতেই (তালাক দেয়া) বৈধ নয়, আর (উপযুক্ত কারণ থাকলেও) চেষ্টা করো যেন (তালাক) না দিতে হয়। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, এখন এটি স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মানবীয় প্রকৃতিসম্মত এবং একে পরিত্যাগ করলেকোনো এক সময় অবশ্যই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এ কারণেই ইউরোপের কিছু রাষ্ট্রকে তালাকের বৈধতা সংক্রান্ত আইন পাশ করতে হয়েছে। "

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪১৩-৪১৪)

এখন আইনেও এটি লেখা থাকে যে, (তালাক দেওয়ার বৈধ কারণ কী? বিভিন্ন মামলায় তারা জিজ্ঞেস করে, কারণ কী, কেন তালাক দেওয়া হচ্ছে, কেন বিচ্ছেদ হচ্ছে? সবকিছুর প্রমাণ দিতে হয়। যাহোক তিনি (আ.) বলেন, এত সহজেই (তালাক) হয়ে যায় না। এ জন্য তাদেরকেও নিজে থেকে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে। জাগতিক আইনকানুন তো আবশ্যিকভাবে বানানোও হয় এবং বাতিলও হয়; সেগুলোকে আরো উন্নত করার জন্য তারা চেষ্টা করতে থাকে, তারপরও কোনো না কোনো ত্রুটি থেকেই যায়। কিন্তু খোদা তা'লার আইন একান্ত মানবপ্রকৃতসম্মত। একথা এখানে আবারো স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, শুধুমাত্র পুরুষদেরই তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় নি, বরং নারীরাও নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে অথবা যে-কোনো কারণে খোলা নিতে পারে। আর যদি পুরুষ দোষী সাব্যস্ত হয় আর তাদের কোনো অন্যায় প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে পুরুষদের মোহরনা দিতে হবে না- এই ধারণা (ভুল)। তাদেরকে মোহরানাও দিতে হবে আর (অন্যান্য) অধিকারও প্রদান করতে হবে। তাই কোন পুরুষ বা নারীর মাথায় যেন এই ধারণা না আসে যে, শুধুমাত্র পুরুষকেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। যখন মহিলাদের বরাতে আলোচনা হবে তখন তার বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

যাহোক, এই বিষয় অব্যাহত থাকবে। তাঁর (আ.) আরো বিভিন্ন উদ্ধৃতি রয়েছে যা এসব বরাতে বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সঠিক শিক্ষা পালন করার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

(১ম পাতার পর.....)

সকলকে আনন্দ দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য, তাতে তাদের কবিতায় যত খুশি মিথ্যার বচন হোক। তাই তারা কখনও ধনীদের প্রশংসা করে, উদ্দেশ্য থাকে কিছু অর্থলাভ বা ভাতা নির্ধারণ করিয়ে নেওয়া, অন্যথায় তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোনও আগ্রহ থাকে না। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি একবার একবার উত্তম পরিধানে পরিহিত কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখে মনে করল, সম্ভবত এরা কোনও নেমন্তন্নে যাচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে যাই। তারা যখন খাবার খেতে শুরু করবে, তখন আমিও সেখান থেকে খেয়ে নিব। তাই সে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। যেতে যেতে সে বাদশাহর দরবারে পৌঁছে গেল। তারা বাদশাহর প্রশংসায় কাসিদা পড়তে শুরু করল। তখন সে জানতে পারল যে, এরা হল কবি, যারা নিজের কবিতা শোনাতে এসেছে। প্রত্যেক কবি পালাক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে কবিতা শোনাতে থাকে। এখন সে খুব ঘাবড়ে গেল, ভাবল, সে এখন কি করবে? কবিতা বলার ক্ষমতা তো তার ছিল না। কিন্তু রসিকতা বোধ তার ছিল। কবিরা তাদের কবিতা শোনানোর পর বাদশাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার নিয়ে ফিরে গেল। এরপর বাদশাহ তাকে সম্বোধন করে বললেন, এবার তুমি শুরু কর। সে বলল, হুযুর! আমি কবি নই। বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, এখানে কেন এসেছ? সে বলল, আমি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ। কবিদের পিছনে পথহারারা এসে থাকে। তারা ছিল কবি আর আমি পথভোলা পথিক। তার এই ভাঁড়ামি বাদশাহর পছন্দ হল। আর তাকেও পুরস্কার দেওয়ার আদেশ দিলেন। এটা নিঃসন্দেহে একটা জনশ্রুতি, কিন্তু কবিদের অনুসারীরা সাধারণত পথভ্রষ্টই হয়ে থাকে। কেননা কবি কখনও এক কথা বলে, কখনও অন্য কথা বলে। তাদের কোনও ধরাবাধাঁ নীতি থাকে না। কখনও তারা রসিকতা করে মানুষকে হাসায়, কখনও ইমাম হোসেন এর শাহাদতের ঘটনা স্মরণ করিয়ে মানুষকে কাঁদায়। কখনও প্রশংসাসূচক কাসিদা পাঠ করে, কখনও তিরস্কারমূলক কবিতা পড়ে। মোটকথা বনে বাদাড়ে উন্মাদের ন্যায় ঘুরে বেড়ায়। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু মহম্মদ (সা.) পৃথিবীতে একেশ্বরবা প্রসারের জন্য এসেছেন আর একটি লক্ষ্যই দিবারাত্র তার মাথায় ঘোরাফেরা করত। আর এর জন্যই তিনি কষ্ট সহ্য করেছেন। তাই কিভাবে তোমরা বলতে পার যে,

সে তিনি কবি। কবি হলে তাঁর কোনও উদ্দেশ্য থাকত না। যে দিক মানুষের ভিড় দেখতেন, সেদিকেই রওনা দিতেন, এবং তাদেরকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি সমগ্র বিশ্বকে নিজের বিরোধীতে পরিণত করেছেন আর সকলকে একত্ববাদের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি কবি হলেন কিভাবে?

এরপর বলা হয়েছে- وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ কবিদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, তাদের কথা ও কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। তারা যা কিছু মুখে বলে তা কাজে করে না। অর্থাৎ তারা যদি কবিতায় মানুষকে উত্তম আচরণ তথা নৈতিকতার উপদেশ দিয়ে থাকে, তবে দেখা যায় সে নিজেই মাতাল। আর যদি সে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করার উপদেশ দেয়, তবে দেখা যায় সে নামায রোযার কাছেও যায় না। কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কথাই হল তাঁর কাজ। যে কথা তাঁর কাজে সেটিই তার মুখে থাকে। তাই মহম্মদ (সা.) কে কবি বলা সত্যকে অস্বীকার করা এবং সত্যকে অনুধাবন করার পরিণাম। গভীরভাবে অভিনিবেশ করলে তোমরা দেখতে পাবে যে, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এবং কবিদের কথায় এবং চরিত্রে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের মাঝে কোনও তুলনাই চলে না।

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ:

(২য় পাতার পর.....)

চুপ থাকতে বললে যদি চুপ না থাকি, তাহলে এমন মানুষের আচরণ সত্যিই উদ্বেগের কারণ। কালের প্রবাহে ধীরে ধীরে এমন আচরণ ভয়াবহ রূপ নেয় এবং এক পর্যায়ে মানুষ ঈমান থেকে দূরে চলে যায়। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয়জনের কথা শোনার এবং প্রিয়জনকে সন্তুষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। জাগতিক ক্ষেত্রে এই ভালবাসাই তাদের প্রিয়জনদের নিকটতর করে নিয়ে আসে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের যে ভালবাসা রয়েছে এবং তাঁর রসূলের সাথে আমাদের যে ভালবাসা রয়েছে তার মোকাবিলায় জাগতিক সম্পর্ক তুচ্ছ। আমি বহুবার বলেছি, আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসার দাবি হল, তাদের নির্দেশ মেনে চলা।

আজকের সমাজ নৈতিক দিক থেকে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমাজ নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা প্রচার মাধ্যম এবং সোশাল মিডিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো মানুষকে ক্রমশ ধর্ম থেকে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে বাজে কথা শেখানো হয় এবং অনৈতিক বিষয়াদি তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যা এই বয়সে হয়তো তাদের জন্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এর ফলে খুব অল্প বয়সেই স্কুল এবং সমাজ তাদেরকে অবাধ চিন্তা করা শিখায় অথবা তাদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের পিতা-মাতার ওপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়।

সন্তানের নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর ন্যস্ত। আজকের যুগে শিশুদের কার্টুন বা ভিডিও গেইমে এমন কাহিনী শোনানো হয় অথবা এমন চরিত্র থাকে যেগুলো কোমলমতি শিশুদের সাথে অসাঞ্জস্যপূর্ণ। এটি শিশুদের নিষ্পাপ মনোবৃত্তিকে হরণ করে। শিশুদেরও এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকা উচিত যে, তারা কোন কার্টুন দেখছে। শিশুরা যখন এগুলো দেখে তখন তাদের দিকে পিতা-মাতার দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন প্রোগ্রাম দেখার সুদূরপ্রসারি যে ফলাফল সেটি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তা ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে আর নৈতিক মূল্যবোধ থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। তাই শিশুরা কোথায় যাচ্ছে, কী দেখছে বা কী করছে, সেদিকে পিতা-মাতার দৃষ্টি রাখা উচিত। বাইরের প্রভাব থেকে তাদের দূরে রাখার চেষ্টা করা উচিত। পিতা-মাতার উন্নত নৈতিক মান সন্তানের সামনে প্রদর্শন করা উচিত, তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত।

স্মরণ রাখা উচিত, শিশুরা খুব বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। তারা আপনাদের কার্যকলাপের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখে। তাই আপনারা শিশুদের যা শেখাচ্ছেন এবং আপনাদের আচরণ এই দুয়ের মাঝে যেন কোনো বিরোধ না থাকে। নিশ্চিতভাবে আহমদী পিতা-মাতা ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী শিক্ষা নিজেরা যদি অনুসরণ না করেন তাহলে তাদের সন্তানরাও বস্তবাদিতায় গভীরভাবে প্রভাবিত হবে এবং সমাজে যে খোদা বিমুখতা রয়েছে, তা দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হবে। তাই আহমদী পিতা-মাতার খুব সাবধানে কাজ করা উচিত। নিজেদের মান উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত যেন সন্তানদের সঠিক পথের দিশা দিতে পারে এবং উত্তম তরবিয়ত করতে পারে। আমি পূর্বেও বলেছি, জামা'তের কোনো কর্মকর্তা যদি আপনাকে কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে অথবা এমন আচরণ করে থাকে যা আপনার দৃষ্টিতে সঠিক নয়, তাহলে বিষয়টি শান্তভাবে সমাধানের চেষ্টা করুন। সরাসরি সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলুন বা সেই ব্যক্তির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে কথা বলুন। এর পরও যদি আপনি আশ্বস্ত না হন তাহলে আপনি যুগ-খলীফাকে লিখতে পারেন। এমন বিষয়াদী সন্তানদের সামনে কখনও আলাপ করবেন না। নতুবা তাদের ওপর এর ভয়ানক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে আর এর ফলে তাদের হৃদয়ে ধর্মের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর তারা সমাজের ভিত্তিহীন চাকচিক্যে প্রভাবিত হবে আর সমাজের ভ্রান্ত প্রভাবের স্রোতে বয়ে যাবে। শিশুদের সাথে প্রতিদিন কথা বলুন। তাদেরকে সেই সমস্ত বিষয় বলুন যা তাদেরকে আল্লাহর নিকটতর করবে এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কাছে টেনে আনবে।

আমি পূর্বেও বহুবার বলেছি, শুরু থেকেই আহমদী পিতা-মাতার নিজ সন্তানদের বলার বিষয়টি যখন সামনে আসে তখন মানুষ বলে, কখনও কখনও মিথ্যা বললে কোনো অসুবিধা নেই এবং তাদের মতে অন্যকে সন্তুষ্ট রাখতে হালকা মিথ্যা বললে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মিথ্যা কথা তা ছোট হোক বা বড়, এটি অনেক বড় পাপ। আমরা অনেকে সেই প্রসিদ্ধ হাদীসটি জানি যাতে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে, জীবনে অনেক পাপ করেছে, সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে যে, কোন পাপ তার সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা উচিত, কেননা সেই ব্যক্তি মনে করত যে, সে নিজের সকল পাপ পরিত্যাগ করতে পারবে না। প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) তাকে বলেন যে, সর্বপ্রথম তোমার মিথ্যা পরিহার করা উচিত। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর উত্তর শুনে খুবই আনন্দিত হয় এবং মনে করে যে, এটি খুব সহজ। পরবর্তীতে যখনই সে কোনো অনৈতিক কাজ করতে গিয়েছে তখন দাঁড়িয়ে চিন্তা করেছে যে, যদি সে ধরা পড়ে তাহলে তাকে নিজের পাপ স্বীকার করতে হবে কেননা সে মহানবী (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, সে মিথ্যা বলবে না। এর ফলে কালের প্রবাহে একে একে সব পাপ সে ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে ইতোপূর্বে অভ্যস্ত ছিল। সেই ব্যক্তি মিথ্যা অব্যাহত রাখতে পারতো কিন্তু সে যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সাথে সত্য বলার অঙ্গীকার করেছে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: সিরিয়ার এক ভদ্রলোক শেয়ার ও স্টক মার্কেটের কেনাবেচায় সুদের উপাদান থাকা এবং এ বিষয়ে নিজের গবেষণার কথা জানিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে চিঠি লেখেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে লেখেন-

গবেষণা করা ভাল। আপনি অবশ্যই এ বিষয়ে নিজের গবেষণা করে আমাকে রিপোর্ট পাঠান। আর যতদূর বর্তমান যুগে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিয্যে সুদের উপাদান থাকার প্রসঙ্গটি রয়েছে, তবে এবিষয়টি বুঝতে হলে এই যুগের ‘হাকাম ও আদাল’ (ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিম্নোক্ত নির্দেশকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। হুযুর (আ.) বলেন, ‘দেশে এখন অধিকাংশ বিষয় ওলট পালট হয়ে গেছে। সমস্ত ব্যবসায় কিছু না কিছু সুদের অংশ রয়েছে। অতএব, বর্তমান যুগে নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।’

(আল বদর, নম্বর-৪১-৪২, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮ই নভেম্বর, ১৯০৪)

এরপর এক স্থানে সুদের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- ‘শরিয়তে সুদের পরিভাষায় বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি লাভের জন্য অপর ব্যক্তিকে টাকা ধার দেয় আর এবং লাভ ধার্য করে নেয়। এই পরিভাষা যেখানে পূর্ণ হবে সেটিকেই সুদ বলা হবে। কিন্তু যে টাকা নিয়েছে, সে কোনও অঙ্গীকার বা চুক্তি না করে নিজের পক্ষ থেকেই বেশি দেয়, তবে সেটি সুদের আওতার বাইরে। সেই কারণেই আম্বিয়াগণ শর্তকে বাইরে রেখেছেন। যদি বাদশাহ কোনও টাকা পয়সা নেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বেশি দেন আর যে ব্যক্তি দিচ্ছে সে যদি এই উদ্দেশ্য নিয়ে না দেয়,তবে সেটিও সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি বাদশহার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ।খোদা তা’লার পয়গম্বর কারো কাছে এমন ঋণ গ্রহণ করেন নি, যা পরিশোধের সময় তিনি কিছু না কিছু অবশ্যই দেন নি। এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, এর জন্য বাসনা যেন না থাকে। আকাঙ্খার বিপরীতে যা কিছু অতিরিক্ত লাভ হয় তা সুদের গণ্ডিভুক্ত নয়। ”

(আল বদর, ১০নম্বর, ২য় খণ্ড, ২৭ শে মার্চ, ১৯০৩)

অতএব, ইসলাম যে সুদ নিষেধ করেছে সেটি হল এই যে, মানুষ যখন কাউকে এই উদ্দেশ্যে ঋণ দেয় যে, পরিশোধের সময় বেশি অর্থ লাভ করবে। কিন্তু যদি ঋণগ্রহণকারী নিজের পক্ষ থেকে কিছুটা বেশি দেয় তবে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এছাড়াও বর্তমান যুগে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রায় প্রত্যেক জাগতিক ব্যবসাবাণিয্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অংশ। আর পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কোনও না কোনও প্রকারের সুদের উপাদান থাকে যা তাদের ব্যবসার অংশ হয়ে থাকে। এই কারণেই হুযুর (আ.) বলেছেন, সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অংশ সুদের অংশ থাকে। এই কারণে বর্তমান যুগে নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

এমতাবস্থায় মানুষ যদি খুব বেশি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে থাকে তাদের জীবনযাপনই দুরূহ হয়ে উঠবে। কেননা সাধারণ জীবনে যে কাপড় চোপড় আমরা পরে থাকি সেই কাপড়ের ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলিতেও কোনও না কোনওভাবে সুদের অর্থ বিনিয়োগ থাকে। আমরা যে রুটি খায়, সেই রুটির ব্যবসাতেও নিশ্চয় কোথাও না কোথাও সুদের টাকার সংমিশ্রন থাকে। মানুষ যদি এই সমস্ত জাগতিক চাহিদাবলী ত্যাগ করে নিজের বাড়িতেই বসে থাকতে চাই, যা বাহ্যত অসম্ভব, তবুও সেই বাড়িটি যে ইট, বালি ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরী হয়েছে, সেই সব জিনিস প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলির ব্যবসায় কোথাও না কোথাও সুদের টাকার সংমিশ্রন থাকে।

তাই খুব বেশি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এবং সংশয়ে নিপতিত হয়ে নিজের জন্য অকারণ সমস্যা তৈরী করা উচিত নয়। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে,হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন-

‘ কিছু মানুষ নিবেদন করল, হে রসুলুল্লাহ্! একটি জামাত আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না যে তারা (সেটিকে জবেহ করার সময়) তার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে কি না। একথা শুনে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমরা গোশত-এর উপর আল্লাহ্‌র নাম (বিসমিল্লাহ) পাঠ করে খেয়ে নিও।’

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর সমীপে নিবেদন করা হয় যে, হিন্দুদের হাতের খাবার খাওয়া কি সঠিক? তিনি (আ.) বললেন, ‘শরিয়ত এটিকে ‘মুবাহ’ (অপছন্দনীয়) হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এমন বিধিনিষেধের উপর শরিয়ত ততটা জোর দেয় নি। আঁ হযরত (সা.) আর্মেনীয়দের হাতে তৈরী খাবার খেয়ে নিতেন আর তা ছাড়া উপায়ও থাকে না।’

(আল হাকাম, নম্বর-১৯, ৮ম খণ্ড, ১০জুন, ১৯০৪)

অনুরূপভাবে লাহোরের ক্লার্ক ও সরকারি অফিসের উকিল হযরত মুনশি মহম্মদ হোসেন সাহেব এর নামে ১৯০৩ সালের ২৫ শে নভেম্বর তারিখে লেখা এক চিঠিতে হুযুর (আ.) লেখেন- আপনি আপনার বাড়িতে বুঝিয়ে দিন যে, এভাবে সন্দেহে নিপতিত হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমন প্ররোচনা জোগানো শয়তানের কাজ। কোনওমতেই প্ররোচনায় পা দেওয়া উচিত নয়। এটি পাপ। আর স্মরণ থাকে যে, সন্দেহের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় না। আর সন্দেহের কারণে কোনও বস্তু অপবিত্রও হতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে অবশ্যই নামায পড়া উচিত। আর আমি দোয়াও করব ইনশাআল্লাহ। আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ ‘সুচিবাই’এর মত সব সময় কাপড় পরিষ্কার করতেন না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- হযরত আয়েশা (রা.) বলেন কাপড়ে বীর্যপাত হলে সেটি শুকিয়ে যাওয়ার আমরা শুধু ঝেড়ে নিতাম। কাপড় ধুতাম না। আর এমন কুয়োঁর পানি খেতাম যাতে ঋতুবতী মেয়েদের ব্যবহার করা কাপড় পড়ে থাকত। বাহ্যিক পবিত্রতা দিয়ে সাধারণ অবস্থার সঙ্গে আপোষ করতাম। খৃষ্টানদের হাতে তৈরী পনীর খেয়ে নিতাম, যদিও বলা হত যে এতে শূকরে চর্বি মেশানো থাকে। মূলনীতি হল, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস না সমস্ত জিনিসই পবিত্র। কেবল সন্দেহের কারণে কোনও বস্তু অপবিত্র হয় না।”

(আখবার আলফযল, কাদিয়ান দারুল আমান, নম্বর-৬৬, খণ্ড-১১)

অতএব, মানুষের উচিত সন্দেহ ও সংশয়ে নিপতিত না হয়ে তাকওয়া অবলম্বন করার মাধ্যমে নিজেদের ও ধর্মের বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা এবং যেখানে সরাসারি কোনও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা কোনও নিষিদ্ধ বস্তু স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, তা থেকে যে কোনও ভাবে বিরত থাকা উচিত। এ বিষয়ে হুযুর (সা.)–এর আরও একটি হাদীস আমাদের সুন্দর পথপ্রদর্শন করে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন-

“ নবী করীম (সা.)কে যখন দুটি বিষয়ের মধ্যে ক্ষমতা দেওয়া হল তখন তিনি সহজ বিকল্পটি বেছে নেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা পাপে পর্যবসিত না হয়। যদি তা পাপের কথা হত তবে তিনি তা থেকে অনেক দূরে থাকতেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনও নিজের জন্য কারো কাছে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয়গুলির বিরুদ্ধাচরণ না হয়েছে আর তিনি আল্লাহ্ জন্য প্রতিশোধ নিয়েছেন।

(বুখারী, কিতাবুল হুদুদ)

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিষয়েও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার আমেরিকা ও ইউরোপের বিস্ময়কর সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কথা উল্লেখ করা হয়। এরই মাঝে একটি কথার উল্লেখ করা হয় যে, দুধ এবং সুপ যা টিনের বাক্সে প্যাকিং হয়ে বিদেশ থেকে আসে তা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত। আর এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলি মোটেই হাত দিয়ে স্পর্শ করা হয় না । দুধও দোহন করা হয় মেশিনের সাহায্যে। একথা শুনে হুযুর (আ.) বললেন, ‘যেহেতু নাসারা জাতি বর্তমানে এমন এক জাতিতে পরিণত হয়েছে যারা ধর্মের সীমানা এবং এর হালাল ও হারামের বিষয়ে কোনও পরোয়া করে নি আর এতে ব্যাপকহারে শূকরের মাংস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর যারা জবেহ করা তারা মোটেই খোদার নাম উচ্চারণ করে না। আর যেনটি শোনা যাচ্ছে, এক ঝটকায় পশুদের মুন্ডু পৃথক করে দেওয়া হয়। তাই সন্দেহ তৈরী হতে পারে বিস্কুট ও দুধ ইত্যাদি যা কিছু সেই সব কারখানায় তৈরী হয় তাতে শূকরের চর্বি এবং শূকরের দুধের ভেজাল আছে। সেই কারণে আমার মতে বিলেতি বিস্কুট এবং এই ধরণের দুধ ও সুপ ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে তাকওয়ার পরিপন্থী এবং অবৈধ। বিলেতে যেভাবে শূকর পালন ও ভক্ষণ বহুল প্রচলিত, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব যে অন্যান্য যে সব খাদ্যদ্রব্য তারা প্রস্তুত করে এদেশে পাঠায় তাতে শূকরের কোনও না কোনও অংশ নেই?

রেঙ্গুনের ব্যবসায়ী আবু সাঈদ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, রেঙ্গুনে ইংরেজদের বিস্কুট এবং ডবল রুটি তৈরীর একটি কারখানা ছিল। একজন মুসলমান ব্যবসায়ী সেই কারখানাটি প্রায় দেড় লক্ষ টাকায় কিনে নেয়। যখন সেই ব্যবসায়ী হিসাবপত্রের খাতা যাচাই করে দেখে বুঝতে পারে যে, শূকরের চর্বিও ঐ কারখানায় কেনা হত। জিজ্ঞাসাবাদ করলে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায় যে, তারা বিস্কুট তৈরীর কাজে তা ব্যবহার করত। কেননা, এটা ব্যবহার না করলে বিস্কুট সুস্বাদু হয় না আর বিদেশেও এই চর্বি এই সব খাদ্যে প্রয়োগ করা হয়।

এই ঘটনা শোনার পর পাঠকগণ অনুধাবন করতে পারে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর দৃষ্টি কতটা তাকওয়া এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি নির্ভর ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের মধ্য থেকে অনেকে এমনও ছিল যারা প্রায় সফর করে থাকে এবং অনেকে আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রাম ও গঞ্জে এখনও রয়েছে যাদের এই ধরণের দুধ ও বিস্কুটের প্রয়োজন হতে পারে। তাই তাদের বিষয়টিও দৃষ্টিতে রেখে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। এছাড়া ভারতবাসীর খাদ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, তারাও বাসনপত্র অত্যন্ত নোংরা করে রাখে। আর প্রায় তাদের কড়াই কুকুরে এসে চাটে। হুযুর (আ.) বলেন- ‘আমার মতে নাসারাদের সেই সব খাদ্য হালাল যেগুলিতে কোনও সংশয় থাকে না আর কুরআন করীমের দৃষ্টিতে যেগুলি হারাম নয়। অন্যথায় এর অর্থ এটাই দাঁড়াবে যে, কিছু বস্তুকে হারাম মনে করে বাড়িতে খেলাম না ঠিকই , কিন্তু বাইরে খৃষ্টানদের হাতে খেয়ে নিলাম আর খৃষ্টানদের উপরেই নির্ভর হয়ে পড়লাম। একজন

শেষাংশ শেষের পাতায়...

ন্যাশনাল মজলিস আমেলা আনসারুল্লাহ্ (যুক্তরাষ্ট্র)-এর সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত

হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

মিটিংয়ের শুরুতে আনসারুল্লাহ একটি মোবাইল এপ্লিকেশন সম্পর্কে বিবরণ দেয় যার মাধ্যমে আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যরা নিজেদের পড়ার গতি অনুসারে কুরআন করীম ও এর অনুবাদ পড়তে পারে। আনসারুল্লাহ্‌র সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এর থেকে উপকৃত হতে পারেব। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরও এখানে দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ কুরআন করীম সম্পর্কে নিজেদের বোধগম্য বৃদ্ধি করতে পারে।

আনসারুল্লাহ্‌র সদর সাহেব ব লেন, আমাদের লক্ষ্য হল এতে এক হাজার প্রশ্ন যুক্ত করা। এখন পর্যন্ত এতে সাড়ে সাতশ প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এই সব প্রশ্নের অধীনে বিভিন্ন তফসীরের বিভিন্ন উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে। আমাদের গবেষক দল এই বিষয়ে কাজ করছে।

এই মোবাইল এ্যাপের আরও একটি উদ্দেশ্য হল আনসার সদস্যরা যেন নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন করীমের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রতিযোগিতার স্পৃহা তৈরীর জন্য একটি লীডার বোর্ডও গঠন করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন পরিবারের সদস্য ও বন্ধুবান্ধবদেরকে যুক্ত করা যেতে পারে। কেউ কোনও প্রশ্নের যতটা বেশি উত্তর দিবে তার নাম লীডার বোর্ডের উপরের দিকে থাকবে। অনুরূপভাবে যার নম্বর বেশি হবে তাকে ব্যাজও দেওয়া হবে। এই মোবাইল এ্যাপটি আল-ইসলামে বিদ্যমান কুরআন করীম এর সার্চ ইঞ্জিনের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। এরপর এই মোবাইল এ্যাপের ডেমো প্রদর্শন করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বাচ্চারা অনেক বুদ্ধিমান হয়, তাদের মাথায় অনেক ধরনের প্রশ্ন জাগে। তাদের মনে তৈরী হওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর না থাকলে তারা বলে দেয় এর উত্তর হয় না। তাই এ বিষয়ে ফিডব্যাক সংগ্রহ করে আরও বেশি প্রশ্নকে এর মধ্যে যুক্ত করুন।

এ বিষয়ে বলা হয় যে, পরবর্তীকালে এই মোবাইল এ্যাপে প্রশ্ন করার বিকল্পও দেওয়া হবে। ইনশাআল্লাহ॥

এরপর আনসারুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি মোবাইল গেম এ্যাপের পরিচিতি তুলে ধরা হয়। এই মোবাইল এ্যাপের নাম রাখা হয়েছে Game-Tobba। এর মধ্যে পরিবার ও শিশুদের জন্য আকর্ষণীয়ভাবে ইসলামের বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে সেগুলির প্রকাশ্যে আনা হবে। এটা হল শব্দ অনুসন্ধানের গেম। একটি দল কোনও শব্দ মনের মধ্যে রাখবে এবং দ্বিতীয় টিম সেই শব্দটি এ্যাপের মাধ্যমে অনুসন্ধান করবে। এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিতও তারা করবে। যেমন 'সালাত, যাকাত, নবুয়্যত, কোনও ধর্মের নাম, কোনও নবীর নাম ইত্যাদি। যে কোনও নাম মনে মনে রাখা যেতে পারে আর সেই শব্দটি না দেখেই বলতে হবে। এতে টাইমারও রয়েছে। এই মোবাইল গেমের উদ্দেশ্য হল আনসাররা যেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মিলে এই গেম খেলে যাতে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে শিশুরা ইসলামের বিভিন্ন পরিভাষা বুঝতে পারে।

এরপর হুযুর আনোয়ার কে এই মোবাইল গেমের ডেমো দেওয়া হয়। এই ডেমোতে প্রথম দল 'ইসলাম' শব্দটি নির্বাচন করে। দ্বিতীয় দল বিভিন্ন প্রশ্ন করে সেই শব্দটি উন্মোচন করে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে আনসারুল্লাহ্‌র পত্রিকা 'নহল'-এর বার্ষিক সংখ্যা উপস্থাপন করা হয়। এই সংখ্যায় সারা বছরের কর্মতৎপরতার চিত্র পরিবেশিত হয়।

এ বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশনের পর নায়েব সদর (প্রথম শ্রেণী) নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি কি কোনও বিশেষ বিভাগের দেখাশোনা করেন।

নায়েব সদর সাহেব উত্তর দেন, আমার উপর সমস্ত নাযেমদের দেখাশোনার দায়িত্ব আছে। এছাড়াও নাযেম এবং যঈমদের পক্ষ থেকে পাওয়া রিপোর্ট চেক করা এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করাও আমার দায়িত্ব।

এরপর নায়েব সদর (দ্বিতীয় শ্রেণী) কে হযুর আনোয়ার প্রশ্ন করেন যে, মোট কতজন দ্বিতীয় শ্রেণীর আনসার আছেন?

তিনি উত্তর দেন, ২হাজার ২৯৪জন আনসার রয়েছেন যারা মোট আনসারের ৫৫ শতাংশ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এর অর্থ কমবয়সী আনসারের সংখ্যা বেশি। তবে তো আপনার মজলিস অনেক বেশি সক্রিয় হওয়ার কথা। নায়েব সদর সাহেব বলেন, তা সত্ত্বেও সমস্ত প্রতিযোগিতায় আমাদের দ্বিতীয় সারির আনসাররা এগিয়ে থাকেন।

হুযুর আনোয়ার এর কারণ জানতে চাইলে নায়েব সদর সাহেব বলেন, তাদের কাছে সময় বেশি থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মৃদু হেসে বলেন, এটা তো অজুহাত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দ্বিতীয় সারির আনসারদের জন্য আপনার পরিকল্পনা কি? নায়েব সদর বলেন, আমাদের যে শেষ ভার্চুয়াল মিটিংটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে হুযুর আনোয়ার (আই.) বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ধরনের আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান রেখেছি। এছাড়াও '৪০+ ফিট ' নামে একটি কর্মসূচি রাখা হয়েছে। প্রতি মাসে এই কর্মসূচির অধীনে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আপনাদের মধ্যে কতজন আনসার সাইকেল চালান? নায়েব সাহেব বলেন, নিয়মিত সাইকেল আরোহীদের সংখ্যা ১৫-২০ শতাংশের কম হবে। কিন্তু যারা নিয়মিত শরীর চর্চা করেন তাদের সংখ্যা ৩০ শতাংশের বেশি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সাইকেলিং-এর দিকেও আপনাদের মনোযোগ দিতে হবে। আর ক্রাস কান্ট্রী সাইকেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন কিম্বা অন্ততপক্ষে সাইকেল চড়ে ভ্রমণের কর্মসূচি পালন করুন। যেমন এখান থেকে ডালাস পর্যন্ত সাইকেল যাত্রা করুন। এই দূরত্ব দুই হাজার কিমি হবে। কত হবে দূরত্ব? জানানো হয় যে এই দূরত্ব ১৩০০ কিমি। হুযুর আনোয়ার বলেন, বেশ। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, এখান থেকে পিটসবার্গ-এর দূরত্ব কত? জানানো হয় যে, পিটসবার্গের দূরত্ব ৩০০ মাইল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রথমে আপনারা এখান থেকে পিটসবার্গ পর্যন্ত যাত্রা করুন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে দিন। যেমন সিয়াটেল থেকে দুইশো মাইল দূরত্বের কোনও স্থান নির্বাচন করুন। অনুরূপভাবে লাসএঞ্জেলস থেকে। বিভিন্ন রিজিনের প্রোগাম রাখা যেতে পারে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের একদল আনসার হল্যান্ড গিয়েছে। তাদের যাত্রাপথ মোট পাঁচশ মাইল। এটা কোনও কঠিন কাজ নয় যা আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি। গত মাসে এরা ফ্রান্সে গিয়েছিল আর প্রায় ৩৫০ মাইল যাত্রাপথ তারা পাড়ি দিয়েছিল। নায়েব সদর সাহেবকে সক্রিয় হতে হবে। সক্রিয় হলে এই ধরণের কর্মসূচি পালন করতে হবে।

এরপর দ্বিতীয় নায়েব (প্রথম সারি) নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার উপর কি কোনও বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? তিনি বলেন, আনসার স্কলারশিপ' কর্মসূচি পরিচালনায় সহযোগিতা করছি যা বিগত ১৩ বছর থেকে অব্যাহত রয়েছে। অনুরূপভাবে সদর মজলিস আমাকে ডক্টর ইউসুফ লতিফ স্কলারশিপ এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছেন যা আমরা এবছরই শুরু করেছি। হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, এই স্কলারশিপ কাদেরকে দেওয়া হয়? তিনি উত্তর দেন, এটা কলেজ ছাত্রদের দেওয়া হয়। এখানে স্থানীয় মার্কিন (স্থানীয় আহমদী) ছাত্রদেরকে দেওয়া হয়।

এরপর সহ-সদর (আই.টি) নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি কি আনসারুল্লাহ্‌র সমস্ত আইটি প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। তিনি উত্তরে বলেন, তিনি অধিকাংশ প্রোগ্রাম পরিচালনার কাজে সাহায্য করেন। টোবা গেম -- শিক্ষা বিভাগের অধীনে শুরু হয়েছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) কায়েদ তবলীগকে তাঁর কর্মসূচি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কায়েদ সাহেব বলেন, আমাদের সমস্ত মনোযোগ এ বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ যে, আনসাররা বাইরে বের হোক এবং সম্মিলিতভাবে তবলীগী কর্মসূচি পালন করুক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সুসংগঠিত তবলীগি গ্রুপের সংখ্যা কতটি এবং কতগুলি লিটারেচর বিতরণ করা হয়েছে? কায়েদ সাহেব বলেন- মজলিস গুলি থেকে মাসিক রিপোর্ট সংগ্রহ করি আর লিটারেচরের বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য নেই। কিন্তু আগামীতে এই প্রশ্নটিকেও আমরা রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বেশ। লিটারেচার, লিফলেট ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে সুসংহতভাবে বিতরণ করতে হবে। আপনারা যদি সুসংগঠিতভাবে তবলীগের কাজে সক্রিয় থাকেন তবে আপনারা নিজেদের অঞ্চলেও এর আয়োজন করতে পারেন।

এরপর কায়েদ মালকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের বার্ষিক বাজেট কত? কায়েদ সাহেব বলেন, বার্ষিক বাজেট ১৩লক্ষ মার্কিন ডলার। হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর জিজ্ঞাসার উত্তরে কায়েদ সাহেব বলেন, আমাদের অধিকাংশ সদস্য উপার্জনশীল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা নেই। আনসারুল্লাহ্‌র মোট সংখ্যা ৪হাজার ১৮৫জন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দ্বিতীয় সারির আনসার মোট আনসারদের ৫৫ শতাংশ। আর দ্বিতীয় সারির আনসারদের মধ্যে আনুমানিক ৮০ শতাংশ উপার্জনশীল। সেই অনুসারে মোট উপার্জনশীল আনসারদের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার হওয়া উচিত। হুযুর আনোয়ার কায়েদ মালকে প্রশ্ন করেন যে, এই চাঁদা সংগ্রহের বিষয়ে তিনি সন্তুষ্ট? কায়েদ সাহেব বলেন, এক্ষেত্রে আরও ভাল করার সুযোগ রয়েছে। গত বছর চাঁদা দাতাদের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই হাজার।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আপনাদের চাঁদাদাতাদের সঠিক হারে চাঁদা দানের বিষয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট?

কায়েদ সাহেব বলেন, কিছু সংখ্যক আনসার সঠিক হারে চাঁদা দেন না। হুযুর আনোয়ার বলেন- এই সংখ্যা ৫০ শতাংশ হবে? কায়েদ সাহেব বলেন, এটা নির্দিষ্টভাবে বলা অনেক কঠিন। হুযুর আনোয়ার বলেন, কঠিন কেন? কায়েদ সাহেব বলেন, কেননা তাদের প্রকৃত আয়ের বিষয়ে আমাদের ধারণা নেই। সেই কারণে এটা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। হুযুর আনোয়ার বলেন-তারা যে আয় জানিয়েছে, সেই অনুসারেই আমি জিজ্ঞাসা করছি। নিজেদের বয়ানে তারা যে আয়ের কথা জানিয়ে থাকেন, সেই অনুসারেই তাদের উপর ভরসা রাখুন।

এরপর কায়েদ তাজনীদ হুযুর আনোয়ারকে তাজনীদের বিষয়ে জানতে চান। তিনি বলেন, আনসারদের মোট সংখ্যা ৪ হাজার ১৮৫জন। এটি জামাতের অনলাইন সিস্টেম যা আমরা শেয়ার করে দিই। হুযুর আনোয়ার বলেন- জামাতের ডেটার উপর নির্ভরশীল হবেন না। নিজেদের ডেটা সংগ্রহ করুন। কায়েদ তাজনীদ বলেন- কায়েদ সাহেব বলেন, আমরা

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র নিজস্ব ডেটাবেস রয়েছে আর আমরা সেটিকে পৃথকভাবে মেনটেন করি। হুযুর আনোয়ার বলেন-এই ডেটায় আপনাদের পৃথক তথ্য রয়েছে যা মজলিসগুলি থেকে সংগ্রহ করেছেন?

কায়েদ সাহেব বলেন, সমস্ত মজলিস আমাদের সিস্টেমে একসেস করতে পারে আর সেখানে তারা তাদের নিজস্ব ডেটা আপলোড করতে থাকে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের মুনতাজিম এই ডেটা সংগ্রহ করতে কি প্রত্যেকের বাড়িতে যায়?

কায়েদ সাহেব বলেন, আমরা বছরে দুই থেকে তিনবার তাজনীদের ডেটা আপডেট করে থাকি আর আমাদের লক্ষ্য থাকে প্রত্যেক নাসেরের কাছে পৌঁছনোর।

এরপর শিকাগোর নাযেমে আলা নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন- আপনাদের রিজনে কতজন আনসার রয়েছেন? নাযেম সাহেব উত্তর দেন, সমগ্র রিজনে আনসারদের সংখ্যা ৩৪৫ জন।

এরপর কায়েদ তরবীয়ত (নওমোবাইন) কে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি যিয়নের সদর জামাত আর নওমোবাইনদের কায়েদ। সব কিছু আপনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। আপনি কি নওমোবাঈ (নবাগত আহমদী)? কায়েদ সাহেব বলেন, আমি নবাগত নই। হুযুর আনোয়ার সদর সাহেবের কাছে জানতে চান যে, এই কাজের জন্য আপনি কোনও নবাগত আহমদীকে পান নি?

সদর সাহেব উত্তরে বলেন, গত বছর হুযুর আনোয়ারের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দেশ অনুসারে আমরা নওমোবাঈনদের জন্য একজন নায়েব কায়েদ নিযুক্ত করেছিলাম যিনি নবাগত আহমদী।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে কায়েদ তরবীয়ত বলেন, আমাদের ৪৮জন নওমোবাঈন রয়েছে আর যে বয়আতগুলি হয়েছে তাতে মজলিস আনসারুল্লাহর মাধ্যমে আরও অন্যান্য মাধ্যমে পাওয়া বয়আতও এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র মাধ্যমে পাওয়া কিছু বয়আতও এর অন্তর্ভুক্ত।

এরপর ভার্জিনিয়ার নাযিমে আলাকে হুযুর আনোয়ার বলেন, মাশাআল্লাহ! আপনার মজলিস তো অনেক বড়। নাযিম সাহেব বলেন, আমাদের চারটি মজলিসে মোট সদস্য সংখ্যা ৫২৫। হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, এদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা হয়? নাযিম সাহেব বলেন, এদের মধ্যে অধিকাংশ কিছুটা দূরেই থাকেন। আমি তাদের সাধারণ ইজলাসে যোগদান করে থাকি এবং তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবেও যোগাযোগ করি। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি এই সব মজলিসে নিজে গিয়েও মিটিং করেন? নাযিম সাহেব বলেন, ইজলাসে অংশগ্রহণ করি যাতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় থাকে।

এরপর সাউথ-ইস্ট রিজনের নাযিম আলা নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন,ভৌগলিকভাবে এই রিজনটি অনেক বিশাল। আমি আটলান্টায় থাকি আর মিয়ামিও আমাদের অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখান থেকে মিয়ামির দূরত্ব ১২ ঘন্টা। এই অঞ্চলে পাঁচটি মজলিস রয়েছে। অনুরূপভাবে ওরল্যাণ্ডো সাত ঘন্টার দূরত্বে অবিস্থত।

হুযুর আনোয়ার বলেন- কিভাবে যোগাযোগ করেন? আপনি কি সমস্ত মজলিসে গিয়েছেন? নাযিম সাহেব বলেন, সমস্ত মজলিসে আমি যাই নি। বিশেষ করে কোভিড-এর কারণে স্থিতাবস্থা তৈরী হয়েছে তা ভেঙ্গে ফলা প্রয়োজন।

হুযুর আনোয়ার সহাস্যে বলেন- যাইহোক এটা আপনাদেরকে একটা ভাল অজুহাত দিয়েছে। এখন আর কোনও অজুহাত করলে হবে না। এখন তো আপনাদের স্থানীয় আইন অনুসারে কোভিড পজিটিভ হওয়ার তিন দিন পর, আপনার রিপোর্ট নেগেটিভ আসুক বা না আসুক, কাজে আপনাকে ফিরতে হবেই। অনুরূপভাবে আপনাদের আনসারুল্লাহর কাজেও একই দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এরপর কায়েদ ইশাআতকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, এই যে পত্রিকাটি দেখানো হয়েছে, এটা কি আপনি তৈরী করিয়েছেন। এর এডিটর কে? কায়েদ ইশাআত বলেন-আমিই এর এডিটর। আমরা ইলেকট্রনিক নিউজ লেটার-এর একটি পাক্ষিক সংস্করণও জারি করেছি যা ইমেল-এর মাধ্যমে সমস্ত আনসারদের কাছে পাঠানো হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন, কতজন আনসার সেই মেল খুলে দেখে এবং পড়ে? কায়েদ ইশাআত বলেন, প্রায় ৯০০ আনসার পত্রিকাটি পড়ে যা দাঁড়ায় প্রায় ২৫ শতাংশ।

এরপর কায়েদ ইসারকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে তার অধীনে কি কি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। তিনি উত্তর দেন, তিনটি প্রোগ্রাম রয়েছে-একটি হল জনকল্যাণমূলক, দ্বিতীয় সাফাই অভিযান এবং তৃতীয়টি হল আর্থিক অনুদান প্রদানের প্রকল্প।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা কি আফ্রিকাতে কোনও আদর্শ গ্রাম প্রকল্পেও অর্থ প্রদান করছেন? কায়েদ সাহেব জানান, এবছর করা হয় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা অনায়াসে প্রতি বছর একটি আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের অর্থায়ন করতে পারেন। আপনাদের আনসাররা অতটা দরিদ্র তো মোটেই নয়। আনসারদের অনেকেই মোটা বেতনের চাকরী করে এবং ব্যবসা বাণিজ্যও করছে। এই প্রকল্পে ৭৫ হাজার ডলার ব্যয় হবে। আপনারা এই অর্থ অনায়াসে একত্রিত করতে পারেন।

এরপর কায়েদ তালিমুল কুরআন নিজের রিপোর্ট পেশ করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন-আপনাদের বিভাগের সম্পূর্ণ নাম হল তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি। আপনি কি কখনও ওয়াকফে আরযি করেছেন? কায়েদ সাহেব বলেন, সাম্প্রতিক অতীতে ওয়াকফে আরযি করেন নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন,আপনার আমেলার সমস্ত সদস্যকে প্রতি বছর এক থেকে দুই সপ্তাহর জন্য ওয়াকফে আরযি করা উচিত। এটা খুব সহজেই করতে পারেন। যখন আপনাদের জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্তরে সমস্ত আমেলা সদস্যরা ওয়াকফে আরযি করতে থাকবেন তখন আপনারা অন্যান্য আনসারদের সামনে আদর্শ হয়ে উঠবেন।

৮ পাতার পর...

আর সংকল্পবদ্ধ ছিল এবং সে তার অঙ্গীকার রক্ষার প্রতিজ্ঞা করেছে তাই এক পর্যায়ে সে মুত্তাকীদের সারিতে দাঁড়িয়েছে এবং মু'মিন হয়ে গেছে। আপনারা যারা এই ইজতেমায় আছেন, আপনারাও নিজেদের ঈমানের ক্ষেত্রে একই অঙ্গীকার করেছেন। তাই এটি আপনাদের পূর্ণ করা উচিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যক্তিগত এবং পরিবারিক বিষয়াদি আমার দৃষ্টিতে আনা হয়। শুধু পাঞ্জাবী অথবা উর্দু ভাষাভাষী লোকেরাই আমার কাছে এ কথা লেখে না, পাশ্চাত্যে যেসমস্ত মহিলারা বড় হয়েছে অথবা পড়ালেখা করেছে, তারাও তাদের শ্বশুরবাড়ি অথবা পরিবার-পরিজনের এমন আচার-আচরণ আমার কাছে লিখে পাঠায় আর এতে অনেক সময় নেযামে জামা'তকেও তারা এতে জড়িয়ে ফেলে এবং বলে যে, তাদের অমুক নিরপেক্ষ নয় এবং একপেশে আচরণ করছে। এ বিষয়গুলো তদন্ত করলে দেখা যায় যে, কিছু অতিরঞ্জন আছে অথবা উভয়পক্ষ মিথ্যা বলছে। এমন বিষয়ে উভয়পক্ষ যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে ঝগড়া-বিবাদ অনেক সুন্দরভাবে সমাধা হতে পারত। জামা'তের কর্মকর্তাদের জন্যও সহজ হয়ে যেত আর কাযা বিভাগও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারত। এমন সমস্যাবলী তখন দেখা দেয় যখন মানুষ সত্য ছেড়ে দেয় আর সত্যকে জলাঞ্জলি দেয় আর অতিরঞ্জিত আকারে বিষয়াদি তুলে ধরে যেন তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। একথা আদৌ চিন্তা করে না যে, সত্য কী আর ন্যায় কী। স্মরণ রাখবেন, মিথ্যায় কোনো বরকত নেই কেননা সত্য কী তা আল্লাহ তা'লা ভালভাবে জানেন। আর মিথ্যা হল চরম পর্যায়ের পাপ যা পারিবারিক শান্তিকে ধ্বংস করতে পারে এবং জামা'তকেও ধ্বংস করতে পারে।মিথ্যার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আমি আরেকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরব। কোনো কর্মকর্তা এক আহমদীর ঘরে না জানিয়েই গিয়ে উঠতে পারে। প্রথম কথা হল, কর্মকর্তার এমন পরিবারের বা জামা'তের সদস্যদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। অনর্থক কাউকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় অথবা অসময়ে কারও ঘরে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি কখনও এমন বিষয় ঘটে থাকে, যদি কোনো কর্মকর্তা অসময়ে কারও ঘরে যায় তাহলে আহমদীদের মিথ্যা বলা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন ঘটনা ঘটেছে যে, জামা'তের কর্মকর্তারা যখন তাদের ঘরে গিয়েছে, তখন শিশুকে মা শিখিয়ে দিয়েছে, বল– মা বাসায় নেই। স্বাভাবিকভাবে শিশু অবশ্যই আশ্চর্য হবে যে, মা কেন তাদরেকে মিথ্যা বলতে বলছে? যদিও পাশ্চাত্যে শিশুকে অনেক অসঙ্গত জিনিস স্কুলে শেখানো হয়। একটা ভাল বিষয় হল, এদেশের স্কুলগুলোতে সত্য বলার বিষয়ে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয় তাই এমন পরিবেশে শিশুকে যদি মা মিথ্যা বলতে বলে তাহলে শিশু আশ্চর্য হবে এবং তার জীবনে এর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। কেউ যদি অতিথির সাথে কথা বলতে না চায় তাহলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত যে, আমি দেখা করতে পারব না, পরে আসুন আর এটি ইসলামিক রীতিসম্মত বিষয়, এতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু পিতা-মাতা যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাহলে তাদের সন্তানরাও পিতা-মাতার আচরণে কপটতা দেখবে। তারা দেখছে, একদিকে মা বলে যে, সত্য বলবে, খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর এবং উন্নত গুণাবলী অবলম্বনের চেষ্টা কর কিন্তু যখন দেখবে যে, মা ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করছে, তখন এ ধরনের দ্বৈত ব্যবহার, দ্বৈত আচরণে শিশুদের বিশ্বাস হারিয়ে যাবে। তখন তাদের পিতা-মাতা যে শিক্ষা দিবে তাতে তাদের কোনো বিশ্বাস থাকবে না। আর তারা তাদেরকে যে শিক্ষা দেবে সে শিক্ষার তারা কোনো গুরুত্বই দিবে না বরং প্রত্যাখ্যান করবে, অবজ্ঞা করবে। এভাবে পিতা-মাতা থেকেও দূরে যাবে এবং ধর্ম থেকেও দূরে সরে যাবে। এমন পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হবে পিতা-মাতা। আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা মু'মিনের মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত তা হল, সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা। মু'মিনের সবসময় নিজের গাম্ভীর্যের খেয়ার রাখা উচিত আর পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে তার আল্লাহ তা'লার প্রতি ভরসা রাখা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন আহমদী নারী এমন হওয়া উচিত নয় যে, সে তৃতীয় পক্ষের কাছে কোনো অপছন্দনীয় কথা শুনে কোনো চিন্তাভাবনা না করেই ফোন ধরেই দ্বিতীয় পক্ষকে গালি দেওয়া আরম্ভ করবে অথবা তার দৃষ্টিতে যে দোষী তাকে ঘৃণ্য কথাবার্তা বলতে থাকবে। এটি পারিবারিক বিষয় হোক বা পরিবারের বাইরের জামা'তী বিষয় হোক। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

(ক্রমশ.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 30 March, 2023 Issue No.13

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মুসলমানও যদি সন্দেহপূর্ণ অবস্থায় থাকে তবে তার খাবারও খাওয়া যায় না। যেমন-একজন মুসলমান, যে কিনা উন্মাদ এবং হালাল ও হারামের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে তার খাবার বা তৈরী করা বস্তুর উপর কিভাবে ভরসা করা যেতে পারে? এই কারণেই আমরা বাড়িতে বিলেতি বিস্কুট ব্যবহার করি না বরং ভারতের হিন্দু কোম্পানির কাছ থেকে ক্রয় করি।

খৃষ্টানদের তুলনায় হিন্দুদের বিষয়টি নিরুপায়তার, কেননা এরা ব্যাপকহারে আমাদের মধ্যে মিলেমিশে গেছে আর সর্বত্র তাদেরই দোকান চোখে পড়ে। যদি মুসলমানদের দোকান থাকে আর যাবতীয় সামগ্রী সেখানে পাওয়া যায় তবে খাদ্যদ্রব্য তাদের (হিন্দুদের) থেকে কেনা উচিত নয়। ”

(আল বদর, নম্বর-২৭, ৩য় খণ্ড, ১৬ই জুলাই, ১৯০৪, পৃ: ৩)

অতএব, সারাংশ এই যে, অতিরিক্ত সংশয়ে পড়ে অকারণ বৈধ জিনিস ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত নয়, আবার বেপরোয়াভাবে প্রত্যেক বৈধ ও অবৈধ বস্তু ব্যবহার করার চেষ্টাও করা উচিত না। বরং একটা সঙ্গত ও বিধিবৎ সীমাপর্যন্ত যাচাই বাছাই করে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন: একজন মহিলা পবিত্র রমযানের এ’তেকাফ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন যে, বাড়িতে এ’তেকাফে বসা যায় কিনা এবং তিনদিনের জন্য এ’তেকাফে বসা যায় কিনা? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখের পত্রে এই মাসলার নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, রমযান মাসের মসনূন (বা সুন্নত) এ’তেকাফের যতটুকু সম্পর্ক তা তো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত যে, বাড়িতে বসা যায় না আর তিনদিনের জন্যও হতে পারে না। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত হয়, মহানবী (সা.) পবিত্র রমযানে কমপক্ষে দশদিন এবং মসিজদে এ’তেকাফে বসতেন। অতএব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমৃত্যু রমযানের শেষ দশদিন এ’তেকাফ করতেন।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল এ’তেকাফ)

একইভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা যেখানে রমযানের মাসলা-মাসায়েল বর্ণনা করেছেন সেখানে এ’তেকাফ সম্পর্কে নির্দেশনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

রমযানের এ’তেকাফের (সময়) প্রথমত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের (মিলনের) অনুমতি নেই আর দ্বিতীয়ত এ’তেকাফের বসার জায়গা হল, মসজিদ বিভিন্ন হাদীসেও এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে যে, রমযানের এ’তেকাফ মসজিদেই বসা যেতে পারে। অতএব এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন,

(সুনান আবী দাউদ, কিতাবুস্ সওম)

অর্থাৎ, এ’তেকাফকারীর জন্য সুন্নত হল, সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না এবং তার সাথে সহবাস করবে না আর একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, রোযা না রাখলে এ’তেকাফ হবে না এবং জামে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও এ’তেকাফ করা যথার্থ নয়।

কাজেই, পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.)-এর হাদীস মোতাবেক পবিত্র রমযানের মসনূন (সুন্নত) এ’তেকাফ কমপক্ষে দশদিন আর এজন্য মসজিদেই বসা হয়।

তবে, রমযান ছাড়া সাধারণ দিনে পুণ্যের খাতিরে এবং সওয়াবের আশায় কেউ নিজের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য এ’তেকাফ করতে চায় তাহলে তারও অনুমতি আছে আর এ সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞা কোথাও পাওয়া যায় না। এছাড়া কোনো কোনো ফিকাহ্বিদ মহিলাদের বাড়িতে এ’তেকাফ করাকে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন। অতএব, ফিকাহ্শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়াহ্’তে লেখা আছে যে,

(উচ্চারণ: আম্মাল মারআতু তা’তাকেফু ফী মাসজিদি বাইতিহা) (হিদায়াহ্, এ’তেকাফ অধ্যায়) অর্থাৎ,

মহিলা নিজের বাড়িতে নামায পড়ার স্থানে এ’তেকাফে বসতে পারে। সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ

(রা.) এ সম্পর্কে বলেন, “মসজিদের বাইরেও এ’তেকাফ করা যেতে পারে তবে, মসজিদের মতো সওয়াব পাওয়া যাবে না।”

(দৈনিক আল্ ফযল, ৬ই মার্চ, ১৯৯৬)

প্রশ্ন: ১২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার গুলশানে ওয়াক্‌ফে নও অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জিজ্ঞেস করে যে, মেয়েদের কোন্ বয়সে স্ক্যার্ফ বা ওড়না পরা উচিত?

হুযূর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন,

উত্তর: যখন তোমার বয়স পাঁচ বছর হয়ে যাবে তখন খবমমরহমং(তথা পায়জামা) ছাড়া তোমার ফ্রক পরা উচিত হবে না। তোমার পা আবৃত থাকা উচিত যাতে তুমি অনুভব করো যে, ধীরে ধীরে আমাদের যে পোশাক আছে তা দিয়ে আমাদের শরীরকে আবৃত করতে হবে। হাতাবিহীন ফ্রক পরা উচিত নয়। এরপর যখন ছয়-সাত বছরের হয়ে যাবে তখন লেগিংস (তথা পায়জামা) পরার ক্ষেত্রে আরও সাবধান হতে হবে। আর তুমি যখন দশ বছরে পদার্পণ করবে তখন কিছুটা স্কার্ফ বা ওড়না পরার অভ্যাস করবে আর যখন এগারো বছরের হয়ে যাবে তখন পুরোপুরি স্কার্ফ বা ওড়না পরতে হবে। স্কার্ফ পরতে তো কোনো সমস্যা নাই। এখানেও মানুষ শীতের সময় স্কার্ফ পরিধান করে। শীত পড়লে (মানুষ) নিজেদের কান ঢাকে না? সেটিও স্কার্ফই হয়ে থাকে। এমন স্কার্ফ (তথা ওড়না) পরিধান করো। কোনো কোনো মেয়ে আছে যাদের দশ বছর বয়স হয়ে গেলেও দেখতে ছোটই মনে হয় আবার কতেক এমন আছে যাদেরকে দশ বছর বয়সেই বারো বছরের মেয়েদের মতো দেখা যায়। তাদের উচ্চতা বেড়ে যায়। কাজেই, প্রত্যেক মেয়ে নিজের দিকে দেখুক! যদি সে দেখতে বড় মনে হয় তাহলে তার স্কার্ফ পরা উচিত। অল্প বয়সে স্কার্ফ পরার অভ্যাস করতে পারলে বড় হয়ে গেলে আর লজ্জা লাগবে না, নতুবা সারাজীবন লজ্জাই পেতে থাকবে। যদি তুমি বলো যে, বারো বছর বয়সে, তের বছর বয়সে, চৌদ্দ বছর বয়সে গিয়ে স্কার্ফ পরবো তাহলে শুধু ভাবতেই থাকবে আর এরপরে তোমরা লজ্জা পেতে আরম্ভ করবে। তখন তোমরা বলবে ওহ্ হো, মেয়েরা (বা আমার সহপাঠীরা) পাছে আবার আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে আরম্ভ না করে। আমি স্কার্ফ পরলে তারা আমাকে নিয়ে হাসবে। তাই (এখন থেকেই) কখনও কখনও স্কার্ফ পরার অভ্যাস করো। সাত, আট, নয় বছরে স্কার্ফ পরা শুরু করো। আর অন্য মেয়েদের সামনেও পরো যাতে তোমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। এরপর যখন তুমি দেখতে বড় মনে হবে তখন পুরোপুরি স্কার্ফ পরো, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর বড় মেয়েদের এতটুকু জানা আবশ্যক যে, আসলে পর্দার উদ্দেশ্য হল লজ্জা-সম্ভ্রম বোধ থাকা। আর যারা ইউরোপিয়ান কিংবা পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়, অতীতকালে তাদের (ইউরোপিয়ানদের) পোশাকও এই পর্যন্ত হতো, (এ সময় হুযূর আনোয়ার তাঁর হাতের কব্জি পর্যন্ত ইঙ্গিত করে বলেন– সংকলক) লম্বা ম্যাক্সি বা ফ্রক পরিধান করতো। এখন তো এরা স্বল্পবসনা হয়ে ঘোরাফেরা করে, তাই না?

প্রশ্ন হল, পুরুষদের ভাল এবং Well Dressed তখন বলা হয় যখন সে ফুল প্যান্ট পরে, কোট গায়ে দেয় এবং টাই লাগায় আর মহিলাদের বলে, তোমাদেরকে Well Dressed তখন বলা হবে যখন তোমরা মিনি স্কার্ট পরিধান করবে। এর দর্শন কী তা আমি বুঝি না।

তাই পুরুষদের দিকে দেখবে না, আর মহিলারাও যারা নিজেদেরকে স্বল্পবসনা করে তারা নিজেদের অসম্মান করে। তাই আহমদী মেয়ে, আহমদী মহিলাদের সম্মান এতেই নিহিত যে, আপনারা নিজেদের সম্মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা করুন। কেননা আসল জিনিস হল, আত্মসম্ভ্রমবোধ। আর এই আত্মসম্ভ্রমবোধই অন্যদেরকে তোমাদের প্রতি নোংরা দৃষ্টি ফেলতে বাধা দেয়

প্রশ্ন: ১২ অক্টোবর ২০১৩ সালে অষ্ট্রেলিয়ার ওয়াক্‌ফে নও মেয়েদের উক্ত অনুষ্ঠান গুলশানে ওয়াক্‌ফে নও-এ একটি মেয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে প্রশ্ন করে যে, আমরা কোন্ বয়সে রমযানের রোযা রাখা শুরু করবো? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: রোযা তোমার জন্য তখন ফরয হবে যখন তোমরা পুরোপুরি ম্যাচিউর বা পরিণত বয়সে পৌঁছবে। তুমি যদি শিক্ষার্থী হও আর তোমার পরীক্ষা চলতে থাকে তাহলে সেদিনগুলোতে যদি তোমার বয়স তের, চৌদ্দ বা পনের হয় তাহলে তুমি রোযা রাখবে না। (আর) যদি তুমি সহ্য করতে পারো তাহলে পনের-ষোলো বছর বয়সে রোযা রাখতে পারো। কিন্তু সাধারণত ফরয রোযা সতের-আঠারো বছর বয়সে ফরয আ আবশ্যক হয়, এরপর অবশ্যই রোযা রাখা উচিত। এছাড়া শখ করে কেউ যদি একটি, দুটি, তিনটি বা চারটি রোযা রাখতে চায় তাহলে আট-দশ বছর বয়সেও রাখতে পারো, কিন্তু তোমাদের জন্য (রোযা রাখা) ফরয বা বাধ্যতামূলক না। তোমরা যখন বড় হবে তখন তোমাদের জন্য রোযা ফরয হবে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

“সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।” *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir